রাতপাখি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :

এপ্রিল ১৯৬১

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

শ্রীগোপাল ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

রাতপাখি

কথা) বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় সবাই চুপ করে গেল। তখন একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। এরকম হয় মাঝে মাঝে। এর নাম নাকি গর্ভবতী নিস্তব্ধতা।

বাচকুন ঘড়িতে দেখলো, ঠিক আটটা চল্লিশ বাজে।

কালকেও ঠিক এই সময়। সকলেই যখন কথা বলছিল, সকলেই গল্প, সামনে চায়ের কাপ, অনেক রকম হাসি, তারই মধ্যে একবার থেমে গিয়েছিল সবাই। তখন এমনিই আপন মনে ঘড়ির সাদা ব্যাণ্ডটা ঠিক করতে করতে বাচকুন সময় দেখেছিল। আটটা চল্লিশ। তার মনে আছে।

বাচকুনের একটু খটকা লাগলো। পর-পর দু দিন। ঠিক একই সময়। অথচ কেউ আগে থেকে ঠিক করে নি কিছুই। বাচকুন সকলের মুখের দিকে তাকালো। দেবকুমার, সোহিনী, ছোটকুদা রোজমেরি অশোক। কেউ কারুর দিকে তাকিয়ে নেই, সকলেরই নত মুখ। যেন একটা শোকসভা। সকলে মিলে এক সঙ্গে কেন চুপ করে আছে? সাতচল্লিশ···আটচল্লিশ···উনপঞ্চাশ···বাচকুন গুন[illegible]। ঠিক পুরো এক মিনিট।

তারপরই ছোটকুদা বললো, গত সোমবারে একটা থিয়েটার দেখতে যাবো ভেবে রেখেছিলাম, শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না, গেলাম একটা সিনেমায়। তবু সিনেমা দেখতে দেখতে সর্বক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল থিয়েটারই দেখছি।

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবু সবাই হেসে উঠলো। ছোটকুদার কথা শুনলেই হাসি পায়। ছোটকুদা তারপরই বললো, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল ভাবলাম বেরিয়ে এসে একটা আইসক্রিম খাবো, ওমা, একটাও আইসক্রিমওয়ালা নেই! [illegible]ত রাজ্যের বাদাম আর ঝালমুড়ি আর চানাচুর। যখন যেটা চাইবো কিছুতেই [illegible]টা···

[illegible]দেবকুমার বললো, ছোটকুদা, তুমি বুঝি আজকাল গলা শুকিয়ে গেলে শুধু [illegible]ক্রিম খাচ্ছো?

অশোক বললো, যখন তোমার ট্যাক্সির দরকার নেই, তখন চোখের সামনে দিয়ে অনবরত খালি ট্যাক্সি···কিন্তু যখন তোমার সত্যিই খুব দরকার···

দেবকুমার বললো, ধানবাদে দেখেছিলে ? বারোজন···ট্যাক্সিতে

সোহিনী বললো, অনেক ছোটবেলায় আমরা একবার ঝরিয়া গিয়েছিলাম···

বাচকুন কোনো কথারই কোনো মানে বুঝতে পারছে না যেন। কথাগুলো কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে ? যেন সকলের আলাদা আলাদা কথা। সে একটাও কথা বললো না। নীরবে উরুর ওপরে শাড়ির আঁচলটা প্লেস করতে লাগলো অন্য মনস্কভাবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি একটু আসছি।

বসবার ঘরের পেছনে একটা সরু বারান্দা। সেটা পেরিয়ে গেলে খাবার ঘর। সেখানে এখন কেউ নেই, তবু দুটো আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপরে স্বচ্ছ কাচের জারে কানায় কানায় ভর্তি জল। ওপরে লেসের ঢাকনা। সাজানো টেবল্ ম্যাটের ওপর উপুড় করা কাচের গেলাস। একটা গেলাস তুলে নিয়ে বাচকুন খুব সাবধানে জল নিল। তারপর ঠোঁটে লাগিয়ে একটু চুমুক দেবার পর তার মনে হলো, ঠিক আটটা চল্লিশে কেন কথা থেমে যায় ? ঠিক এক মিনিটের জন্য ? এটা কার নির্দেশ ?

গেলাসটা নামিয়ে রেখে সে আবার ভাবলো, ধুৎ, ওসব কিছুই নয়। একেই বলে কাকতালীয়।

বাচকুন জানলার ধারে আসে। আজ সামান্য জ্যোৎস্না আছে। কাল মেঘলা মেঘলা দিন ছিল, শেষ রাতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। জ্যোৎস্না রাত বাচকুনের সবচেয়ে প্রিয়। বিশেষত এইরকম বাইরের খোলা জায়গায়। পেছন দিকের এই জানলাটা দিয়ে চোখের সামনে অনেকখানি—অনেকখানি পৃথিবী। এদিকে আর কোনো বাড়ি নেই। বেশ দূরে, ডান দিকে পাহাড়ের আভাস। আবছা নীল রঙের জ্যোৎস্না। বড় দেবদারু গাছটা এখন যেন খুব গর্বিত হয়ে।

ওই দেবদারু গাছটার পরেই একটু ঢালুতে নেমে, একটা যা অপূর্ব সুন্দর জায়গা। ওখানে আজ রাত্রেই একবার গেলে···আজ রাত্রেই, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

জ্যোৎস্না খুব ফ্যাকাশে, যেন যখন তখন চলে যাবে। দূরে ভাল্লুকের দঙ্গলের মতন মেঘ। এত অল্প আলোয় এখান থেকে সেই সুন্দর জায়গাটা দেখাই যায় না। বাচকুনের একটু মন কেমন করলো। কেন দেখা যাচ্ছে না। ধুৎ, ভাল লাগে না।

বাচকুন আবার ফিরে এলো বসবার ঘরে। ছোটকুদা দারুণ জমিয়েছে। বাচকুন নিজের চেয়ারে বসে, ডান দিকের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে থুতনিটা রাখলো তালুতে। গল্পে মন দেবার জন্য দু' চোখের মাঝখানে মনটাকে নিয়ে এলো।

ছোটকুদা বললো, দোকানটায় আমাকে তো দারুণ ঠকিয়ে দিল। সস্তার লোভে বিলিতি আফটার শেভ বলে যেটা কিনলাম, হোটেলে ফিরে দেখি সেটার মধ্যে স্রেফ ডেটল্। পরদিন ভোরবেলাই আমার বাঙ্গালোর থেকে ফেরার কথা ছিল। ফ্লাইট ক্যানসেল্ড হয়ে গেল। থাকতে হলো আর একদিন। পরদিন আমি সেই দোকানে আবার গেলাম। কেন গেলাম, বল্‌তো? কোনো দরদাম না করে ঠিক সেই জিনিসই আর একটা কিনলাম। দোকানের লোকটা আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। ও ভেবেছে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, তাই মনের আনন্দে ঠকাচ্ছে। কিন্তু আমি যে সবই বুঝে গেছি, তা তো ও জানে না। কাজেই আমিও ওকে ঠকালাম। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ

সোহিনী বললো, ওঃ ছুটকুদা, তুমি সত্যি অদ্ভুত? ভেজাল জেনেও তুমি দুবার একই জিনিস কিনলে?

ছোটকুদা বললো, বাঃ, আমার মত আর কেউ ওকে কখনো ঠকিয়েছে? জেনে-শুনেও কেউ ভেজাল জিনিস ওর দোকান থেকে আগে কিনেছে? আমি পর পর দুদিন গিয়ে দুটো কিনেছি বলেই ও আমার ব্যাপারটা একদিন না একদিন ঠিক বুঝতে পারবে। আমি দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় লক্ষ করেছিলুম, লোকটা খুব যেন চিন্তায় পড়ে গেছে। এঃ হিঃ হেঃ হেঃ হেঃ···

অশোক বললো, ছুটকুদা, তুমি সেই বোম্বের গল্পটা বলো! সেই যে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে···বউদি, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্যাট ওয়ান? অ্যাবাউট দ্যাট স্ট্রীট আরচিন?

ছোটকুদার স্ত্রী রোজমেরি সব বাংলা বোঝে। তবু অশোক তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলবেই। রোজমেরি উত্তর দেয় বাংলায়।

রোজমেরি বললো, আমার বর কক্ষনো এক গল্প দু বার বলে না।

ছোটকুদা হেসে বললো, দেখলি তো! আচ্ছা শোন, তোদের একটা আর্মেনিয়ান বুড়ীর গল্প বলি, পার্ক সার্কাসে একটা বাড়িতে আলাপ হয়েছিল।

সোহিনী বললো, বাচকুন আজ এত চুপচাপ আর অন্যমনস্ক কেন?

বাচকুন ঘোর ভেঙে সজাগ হয়ে বললো, অ্যাঁ? কই না তা?

দেবকুমার বললো, অন্যমনস্ক থাকলেই বাচকুনকে বেশী সুন্দর দেখায়!

দেবকুমারের এই হালকা কথায় বাচকুন কোনো গুরুত্বই দিল না। তার মুখে

একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তারপর বললো, আমি তো গল্প শুনছিলাম। কিংবা, আমার বোধহয় খিদে পেয়েছে।

কেউ একজন বললো, বোধ হয় মানে কি ? খিদে পেলে টের পাওয়া যায় না।

সোহিনী বললো, বাচকুনটা ওই রকম উল্টোপাল্টা কথা বলে। খিদে তো পাবেই, বেশ রাত হয়েছে। চলো—

ছোটকু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, ঠাকুর! ঠাকুর!

খাবার ঘরে এসে টেবিলের ডান দিকে দ্বিতীয় চেয়ারটাতে বসলো বাচকুন। কাল দুপুরে, এখানে প্রথম এসে, ওই চেয়ারটাতেই সে বসেছিল। তারপর থেকে প্রত্যেকবারই ওইখানে বসছে। অন্যরাও সবাই ঠিক যে-যার একই চেয়ারে। কেউ তো কিছু ঠিক করে দেয় নি কাকে কোন চেয়ারে বসতে হবে, তবু প্রত্যেকের জন্য একটি চেয়ার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বাচকুনের চেয়ার থেকে খোলা জানলা দিয়ে দেবদারু গাছটাকে দেখা যায়। দেবদারু গাছটাও বাচকুনকে দেখতে পায়।

সোহিনী বললো, বাচকুন, তোর কথাতেই এখানে এলাম। তবু এই মনমরা হয়ে আছিস কেন ?

—না তো।

—কাল থেকেই তো দেখছি।

—কাল এসেই দেখলাম কিনা, মেঘলা মেঘলা, তারপর বৃষ্টি, তাই কি রকম খারাপ লাগলো।

—বৃষ্টি হয়েছে তো কি হয়েছে ?

—এই সময় বৃষ্টি···ভালো লাগে ? এরকম কথা ছিল না।

রোজমেরি অশোককে বললো, ডালটা এগিয়ে দাও তো।

তারপর খুব মন দিয়ে ডাল ঢালতে ঢালতে বললো, বাচকুন খুব চমৎকার কথা বলে, একটু ইনকোহেরেন্ট, সেই জন্যই। তোমার সঙ্গে কার কথা ছিল না, বাচকুন ?

পুরুষরা খুকখুক করে হাসলো। অশোক বললো, তুমি ঠিক ধরতে পারলে না বউদি। বাচকুন বলতে চাইছে, শীতকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না, সেই জন্যই, কথা ছিল না।

রোজমেরি জোর দিয়ে বললো, সেটা আমি জানি, শীতকালে বৃষ্টি হয় না জানি, তবু যেন ও আর একটু বেশী কিছু বলেছে। তাই না বাচকুন ?

— না তো!

—দেখলে বউদি দেখলে।

রোজমেরি বাচকুনের দিকে হাসি ভরা চোখে তাকালো। সে বেশ উপভোগ করছে বাচকুনের অন্যমনস্কতা।

দেবকুমার বললো, আজ আর বৃষ্টি পড়বে না।

বাচকুন জানলা দিয়ে তাকালো। একটু আগের জ্যোৎস্না এখন মুছে গেছে। আকাশ ময়লা। দেবদারু গাছটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

সে বললো, খেয়ে উঠে একটু বাইরে বেড়াতে যাবে?

—এখন, এত রাত্রে? বেশ শীত ··

—খুব বেশী না···

ছোটকু বললো, চলো, একটু ঘুরে আসা যাবে। মাছের ঝোলটা বেশ ভালো হয়েছে, না?

—ছোটকদা তুমি আর একটু নেবে? নাও না!

—না। ভালো লাগলেই বুঝি বেশী খেতে হয়?

হাত ধোওয়ার জন্য জল গরম করা আছে। শীতের রাত্রে এই একটা বেশ চমৎকার বিলাসিতা। খুব আরাম। হাত ধুতে ধুতে বাচকুনের মনে হলো, এই যে একটু আগে ছোটকুদা মাছের ঝোলের প্রশংসা করলো, সোহিনী তখন তাকে আর একটু নিতে বললো, তার উত্তরে ছোটকুদা বললো, ভালো লাগলেই বুঝি বেশী খেতে হয়—ঠিক এই কথাগুলোই সে যেন আগে কোথায় শুনেছে। কোথায় ঠিক মনে করতে পারছে না। ঠিক এইরকমই একটা খাওয়ার টেবিল। এইরকম লোকজন, এই সব কথাবার্তা নিয়ে যে ঘটনা তা আগে একবার ঘটে গেছে। স্পষ্ট মনে হয়।

আবার বসবার ঘরে এসে সিগারেট ধরাবার পর পুরুষদের আর বেড়াতে যাবার বিশেষ ইচ্ছে দেখা গেল না। খাওয়ার পরে বেশী শীত করে। ছোটকু পা গুটিয়ে বসেছে।

—কই যাবে না বাইরে?

—আজ ছেড়ে দে। কাল সকালে খুব বেড়ানো যাবে

সোহিনী বললো, তোমরা বড্ড কুঁড়ে হয়ে গেছ। বেচারার একটু ইচ্ছে হয়েছে, চলরে আমরাই যাই। বউদি এস

ভালো করে শাল জড়িয়ে তিনটি মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে কাচের দরজা খুলে গাড়ি বারান্দায়, তারপর একটু এগিয়ে লোহার গেট খুলে সুরকি বেছানো রাস্তায়।

তেসরা ডিসেম্বর সকালে, কলকাতার বাড়িতে, বিছানায় ঘুম ভেঙেই বাচকুনের প্রথম মনে পড়েছিল হাজারিবাগ। কেন মনে পড়েছিল তার কোনো কারণ নেই। দু'একটা শব্দ দু'একটা গানের লাইন যেমন হঠাৎ হঠাৎই মনে পড়ে। তেমনি মনের মধ্যে একটা নাম ঘুরতে লাগলো হাজারিবাগ। সকালের কথা অনেক সময়ই বিকেলে আর মনে থাকে না। কিন্তু সন্ধেবেলাতেও মনে রইলো। পরের দিনও। পরের দিন বাচকুন সোহিনীকে বলেছিল, দিদি এবার হাজারিবাগ বেড়াতে যাবি ?

—হাজারিবাগ ? হাজারিবাগ কেন ?

—এমনিই।

—হাজারিবাগ কি এমন জায়গা ?

সত্যিই, হাজারিবাগ এমন কিছু আহা মরি জায়গা নয়। বাচকুনও তা জানে। বেশ কয়েকবছর আগে সে একবার হাজারিবাগে গিয়েছিলও। তবু নামটা মনে এসেছে বলে কথার কথা হিসেবে বলেছিল মাত্র।

শীতকালে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়। ছোটকুদের বাড়ি আছে রাঁচীতে। সোহিনীর ইচ্ছে ছিল রাজগীর। তবু ঠিক মনস্থির হয় না। তারপর দেবকুমার জানতে পারে হাজারিবাগে তার এক বন্ধুর লোভনীয় বাড়ির কথা। তা হলে হাজারিবাগেই। যদি এখানে ভালো না লাগে তাহলে রাঁচী তো বেশী দূর নয়। এখানে এসে বাড়িটা সকলেরই পছন্দ হয়ে গেছে। বেশ গাম্ভীর্যময় প্রাচীন বাড়ি। চার পাশটা ফাঁকা। আসলে যে-কোনো জায়গায় গিয়ে ছুটির আড্ডাটা জমালেই হলো।

রাত দশটায় হাজারিবাগের রাস্তা একেবারেই নির্জন। এদিকটা আরও। তিন নারী সুরকির পথ ধরে লঘু পায়ে এগোচ্ছে। একটু বাদেই বাচকুন রাস্তা ছেড়ে ডান পাশে নামলো।

সোহিনী বললো, তুই মাঠের মধ্যে কোথায় যাচ্ছিস ?

—চলো না। দেবদারু গাছটার পেছন দিকটার একটা ঢালু জায়গা আছে।

—সেখানে কি ?

—কিছুই না। এমনিই।

—রাত্তিরবেলা মাঠের মধ্যে আর যেতে হবে না।

রোজমেরি বাচকুনকে সমর্থন করে বললো, চলো, চলো মাঠে বেড়াতেই ভালো।

কয়েক পা গিয়ে অবশ্য রোজমেরিই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখ বড় বড় করে বললো, যদি সাপ থাকে? আমার সাপের বড় ভয়।

সোহিনী হেসে বললো, সাপের ভয় সকলেরই আছে। কিন্তু শীতকালে সাপ থাকে না।

—ঠিক, তাহলে তো ভয় নেই।

বাচকুন অনেকটা এগিয়ে গেছে। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বলে তাকে আর দেখা যায় না। মেঘলা আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া আলো। সোহিনী রোজমেরিও ঢালু জায়গাটা দিয়ে নামতে লাগলো।

এখানে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। কিংবা নালা। কিন্তু জল বেশ পরিষ্কার, যদিও ছিবছিবে।

রোজমেরি বললো, এখন আমি সারারাত বেড়াতে পারি।

সোহিনী বললো, তুমিও তো বাচকুনের মতন একটু পাগল।

বাচকুন নালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে। যেন সে একটা কিছু গভীরভাবে দেখছে। যদিও দেখবার মতন বিশেষ কিছুই নেই। তার পেছনে দেবদারু গাছটা অন্ধকারে জয়স্তম্ভের মতন উঁচু হয়ে আছে।

সোহিনী নালাটা পার হবার জন্য পা বাড়িয়েছে, বাচকুন তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরলো। বললো, দিদি, ওদিক যাস নি।

—কেন?

—ওদিকটা খুব সুন্দর না?

—সুন্দর বলে···যাবো না?

—আমি সকালে এখানে একবার এসেছিলাম, কী অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা, ছোট ছোট পাথর, ঝকঝকে তকতকে, কী রকম যেন পবিত্র পবিত্র একটা ভাব—মনে হয় যেন আমাদের জন্য নয়।

—তুই কী যে বলিস, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।

—কোনো কোনো জায়গা, কিংবা কোনো সুন্দর জিনিস দেখে তোর মনে হয় না, এটা আমাদের জন্য নয়?

রোজমেরি হাত ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করলো। ফটাস করে লাইটার জ্বালাবার শব্দটা কর্কশ শোনালো একটু। প্রথম ধোঁয়াটুকু উপভোগ করে সে বললো, এদিকের থেকে ওদিকের জায়গাটা বেশী সুন্দর কি-না তা আমি জানি না। শুধু বাচকুনই এসব দেখতে পায়। বাচকুন সব সময় শুধু সুন্দর জিনিস দেখে।

বাচকুন তীক্ষ্ণ গলায় বললো, না!

রোজমেরি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি?

না, আমি সব সময় সুন্দর জিনিস দেখি না!

বাচকুনের ভুরু কুঁচকে গেছে। সোহিনী সেদিকে তাকিয়েই বুঝলো। সে বললো, চল্ এবার ফিরি।

—আমি শুধু সুন্দর জিনিস দেখি না। আমি অনেক অনেক খারাপ জিনিসও দেখি।

সোহিনী একটু ধমক দিয়ে বললো, থাক আর বলতে হবে না। ওরকম সবাইকেই দেখতে হয়। রাস্তাঘাটে ঘুরতে গেলে।

তিনজনেই বাড়ির দিকে ঘুরেছে। তবু রোজমেরি একটু কৌতূহলের সঙ্গে নালার উল্টো দিকটা আর একবার দেখলো।

বাচকুন রোজমেরির ওপর যেন একটু রেগে গেছে। যে কবারই সে রোজমেরির দিকে তাকাচ্ছে তার দৃষ্টিতে বেশ ধার।

রোজমেরি জিজ্ঞেস করলো, নার্ভ, নাভের বাংলা কী?

—স্নায়ু।

রোজমেরি বাচকুনের বাহুতে সস্নেহ হাত রেখে বললো, তোমার স্নায়ু কি একটু চঞ্চল হয়ে আছে?

—না তো।

—জানো বাচকুন, লণ্ডনে যখন দারুণ ভারী ভারী বোমা পড়ছে, নাইনটিন ফরটি থ্রি, সেই সময় আমার জন্ম···সেই জন্যই, আমার স্নায়ু দুর্বল···

বাচকুন কিছু শুনছে না। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

সেটা হয়েছিল মাইথন থেকে ফেরার পথে। মাস দু'এক আগে। কী একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল, সেখানে থামার কথা নয়, লাইনের দু'পাশে অনেক লোক সকলেরই মুখ অন্যলোকের মুখের মতন। ট্রেনের কামরার লোকরা কৌতূহলী ছিল ট্রেন থামবার জন্য। বাচকুন বসেছিল কামরার বাঁ পাশের জানলার পাশে, ডান পাশের জানলা থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ইস, দেখো দেখো! তার চিৎকারের মধ্যে এমন একটা আকস্মিকতার জোর ছিল যে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সকলেই সেই দিকে দৌড়ে গেল, বাচকুনও গিয়েছিল, কিছু না বুঝেই। অন্যরাও দেখছে বলে সেও মুখ বাড়িয়েছিল। সেই সময় কেউ যেন তার বুকে একটা ধাক্কা মারলো। কেউ মারে নি, একটা দৃশ্য।

স্টেশনের উল্টো দিকে একটা থেমে থাকা ট্রেনের ছাদে একটি মানুষের দেহ পুড়ছে। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, পাশে দুটো চালের বস্তা, হুমড়ি খেয়ে আছে ইলেকট্রিক তারের ওপর। বোধহয় লাফাতে গিয়েছিল, হাত দুটো ঠিক সেই অবস্থায় বাড়ানো, শক্ত—মাথায় চুলগুলো পুড়ে গেছে, শরীরটা প্রায় সাদা, পেটের কাছে তখনও চিড়িক চিড়িক করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ··। বাচকুন দু'এক মুহূর্তের জন্য দেখেই মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল, তারপর কিছু না ভেবেই আবার ওদিকে ফিরলো এবং আর এক পলক দেখেই সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলো।

তার মুখখানা বিবর্ণ, চোখে আর পলক পড়ছে না। কেন সে দেখতে গেল। কেন দ্বিতীয়বার তাকালো। ওরকম বীভৎস দৃশ্য দেখেও সে কেন দ্বিতীয়বার আবার মুখটা ফিরিয়ে নিল। বাচকুন ফিরে এসে বসেছিল নিজের জায়গায়, কিন্তু সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ওই দৃশ্যটা ছাড়া।

কামরায় সবাই নিচু গলায় তখন ওই বিষয়েই আলোচনা করছিল। কে কোথায় আর কত বীভৎস রকমের · বাচকুনের মনে হচ্ছিল সব শব্দই ক্রমশ আস্তে হয়ে যাচ্ছে।

কেউ একজন বলেছিল, চালের বস্তাগুলো কিন্তু ঠিকই আছে।

আর একজন কেউ বলেছিল, ওই চাল হয়তো আবার মানুষে খাবে।

—একেবারে পুড়ে যাবে, পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাবে, কেউ নামাতে পারবে না···

ওই ছেলেটার বাড়ির লোকজন ··ইস্

বাচকুনের এক বান্ধবী জয়া তখন বাথরুমে ছিল। সে দেখে নি। সে ফিরে এসে বাচকুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই শর্মিলা, কি হয়েছে তোর? কি হয়েছে এখানে?

বাচকুন শূন্য চোখে তাকিয়েছিল বান্ধবীর দিকে। তার মনে হয়েছিল, জয়া তার চেয়ে কত সুখী!

এর একমাস পরেও যখন ছেলে, চাল কিংবা ট্রেন এই শব্দগুলো শুনলেই তার মনে পড়তো ওই দৃশ্যটা, তখন বাচকুন একদিন কাতরভাবে বলেছিল, কেন আমি শুধু শুধু এত কষ্ট পাবো? আমার কি দোষ? তবু কেন আমার এই শাস্তি? কেন আমার চোখের সামনে যখন তখন ওই ছবিটাই···। একথা বাচকুন কাকে বলেছিল? কারুকে না। এতো অন্য কারুকে বলার নয়। ঈশ্বরকেও না। শুধু নিজের মনে মনেই বারবার বারবার···।

রাস্তার ওপরে এসে ওরা দেখলো পুরুষ তিনজন গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটকু বললো, আমরা ভাবলাম, তোমরা আবার হারিয়ে-টারিয়ে গেলে নাকি।

সোহিনী বললো, আমরা কতক্ষণ আর গেছি, বেশিক্ষণ তো বেড়াই নি।

রোজমেরি বললো, আমরা একটা খুব সুন্দর জায়গা দেখে এলাম।

বাচকুন আবার ধারালোভাবে রোজমেরির দিকে তাকালো।

রোজমেরি বললো, আমার সত্যি খুব সুন্দর লেগেছে!

দেবকুমার বললো, তাহলে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলে না কেন?

রোজমেরি বললো, তোমরা যাও নি ভালই হয়েছে। তোমরা পুরুষরা গেলে বড় গোলমাল করতে। তোমরা সব জায়গায় জোরে জোরে কথা বলো।

অনেকক্ষণ বাদে বাচকুন রোজমেরির সঙ্গে একমত হলো।

দেবকুমার বললো, চলো বাচকুন, তোমাতে আমাতে আর একবার ঘুরে আসি!

বাচকুন বললো, না।

মনে মনে সে বললো, তোমার সঙ্গে আমি ওই জায়গাটায় কক্ষনো যাব না যদি তোমার মনে হয় জায়গাটা এমন কিছুই নয়। যদি তুমি হাসো!

দেবকুমার তবু বাচকুনের বাহু ছুঁয়ে বললো, চলো না।

বাচকুন কাতরভাবে বললো, আমার খুব শীত করছে।

সে আকাশের দিকে তাকালো। জ্যোৎস্না নেই।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে টানা লম্বা, পুরনো আমলের শ্বেতপাথরের ঢাকা বারান্দা। ঝাড়লণ্ঠন লাগানো আছে, কিন্তু জ্বলে না। তার বদলে নিয়ন। বারান্দায় এক পাশে তিনটি শোবার ঘর। ঘরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার আমলের নকশাকাটা জাঁদরেল পালঙ্ক।

ছোটকু বারান্দার কোলাপসিবল গেট টেনে বন্ধ করলো। তারপর বললো, কী, এক্ষুনি শুয়ে পড়া হবে?

—সাড়ে দশটা প্রায় বাজে।

—কিছুই না

—তবু মনে হচ্ছে যেন মাঝ রাত। একটু শব্দ নেই।

বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেবকুমার বললো, আবার মেঘ জমেছে। আজ রাত্তিরেও বোধ হয় বৃষ্টি হবে। ঠাণ্ডাটা আরও পড়বে।

সোহিনী বললো, না আর বৃষ্টি হবে না।

যেন বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ভার তার ওপর, এইভাবে সোহিনী একটা হুকুম দিয়ে দিল। তারপর বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি বাবা শুতে যাই। তুই আসবে, বাচকুন ?।

সোহিনী আর বাচকুন এক ঘরে। দুই বোন বাইরের শাড়ি ছেড়ে রাত-পোশাক পরে নিল। মুখে ক্রিম ঘষলো। চুলে লম্বা করে চিরুনি চালালো। সোহিনীরই তো সব কিছু শেষ হয়ে গেল আগে। মুখ দিয়ে শীতের উঃ হু হু হু হু শব্দ করতে করতে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে বললো, তুই কি বই পড়বি নাকি ?

—এই খানিকক্ষণ।

—মনে করে আলো নিবিয়ে দিস।

এক পাশের ঘরে ছোটকু আর রোজমেরি অন্য পাশের ঘরে বাকি ছেলেরা। ছেলেদের ঘর থেকে এখনো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাচকুন। সে এখন না ঘুমোতেও পারে। ইচ্ছে করলে গল্প করতে যেতে পারে পাশের ঘরে ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু কী গল্প ? হয়তো ছেলেরা এখন ছেলেদের গল্প করছে। ছেলে ? একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে হুমড়ি খেয়ে আছে ট্রেনের ছাদে···হাত দুটো বেঁকে শক্ত হয়ে গেছে···পাশে দুটো চালের বস্তা, সেই চাল অন্য কেউ খাবে। কেন রোজমেরি বললো।

সব কটা জানলাই বন্ধ। এত শীতে জানলা খুলে শোওয়া যায় না। তবু বাচকুন একটা জানলার পাশে এসে খড়খড়ি তুলে একটু দেখলো। আকাশে বিশ্রী খসেখসে কালো রঙের মেঘ। এরকম কথা ছিল না।

খড়খড়ি দিয়ে শাণিত হাওয়া এসে লাগছে বাচকুনের গালে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। বাচকুন গালে হাত রাখলো। যেন নিজের নয়, অন্য কারুর।

বাচকুন একটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারটায় বসলো। কিন্তু একটু বাদেই সে বুঝলো তার একটুও মন বসছে না। শীতের রাতে, সামনে বিছানা থাকলে কিছুতেই একটু দূরে চেয়ারে বসে থাকা যায় না। তার শুতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে গেলে হঠাৎ এক সময় ঘুম এসে যায়। উঠে আর আলো নেবানো হয় না। সারা রাত আলো জ্বলে।

বাচকুন বই মুড়ে রেখে আলো নিবিয়ে দিল। লেপের তলাটা সোহিনী আগেই গরম করে রেখেছে। মস্তবড় লেপ, দু'জনের বদলে চারজনকেও ঢাকা দিতে পারে।

চোখ বুজে সে একটু অপেক্ষা করলো, কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা। সে দেখলো শুধু অন্ধকার। কলকাতার থেকে এদিককার অন্ধকার বেশী গাঢ়। সে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেললো।

তারপর খুব আস্তে আস্তে ঘুম আসতে লাগলো। নরম আদরের মতন, সারা গায়ে ছড়িয়ে যায় ঘুম, ঘুমেব ওজনে শরীরটা একটু ভারী হয়ে যায়। তারপব ঠিক যেন অতল জলে ডুবে যাওয়ার মতন···কী সুন্দর আরাম!

বুকের ওপর একটা হাত রেখে ঘুমিয়ে রইলো বাচকুনের তেইশ বছরের শরীব। তার চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে। ঠোঁটে খুব পাতলা একটা দুঃখ দুঃখ ভাব।

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল বাচকুনের। কেন? কোনো শব্দ হয় নি, গা থেকে লেপ সরে যায় নি, তবু। পুরো চোখ মেলে তাকাবার মতন ঘুম ভাঙা। এবং মনে হয়, সহজে আর ঘুম আসবে না। কেন এরকম হলো? তার কি জলতেষ্টা কিংবা বাথরুম পেয়েছে? কোনোটাই তো পায় নি।

তবু খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর বাচকুন উঠে পড়ে জল খেল। এবং শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে গেল। না হলে আর ঘুম আসবে না। অন্য দু'ঘরের সবাই গভীর ঘুমে। সে কেন একা জেগে থাকবে?

বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা সরু সুতো দিয়ে কে যেন বেঁধে ফেললো বাচকুনকে। সে থমকে দাঁড়ালো। সুতো নয়, মাকড়সার জাল। এত মাকড়সার জাল এলো কোথা থেকে? বোধ হয় বাথরুমের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু মুখ তুলে সে দেখলো, বারান্দায় লম্বা লম্বা মাকড়সার জাল উড়ে বেড়াচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম হলেও স্পষ্ট দেখা যায়। হয়তো বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত টানা কোনো জাল ছিল, কোনো কারণে একটু আগেই ছিঁড়ে গেছে।

তারপরেই বাচকুন টের পেল, সে বারান্দার আলো জ্বালে নি, তবু মাকড়সার জাল দেখতে পাচ্ছে। ঘর থেকে যখন বেরিয়েছিল, অন্ধকার ছিল, এখন কোথা থেকে যেন আলো আসছে। কোথা থেকে আবার, আকাশ থেকে!

মেঘের মধ্যে ফাটল ধরেছে, তার ভেতর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ছলাৎ ছলাৎ করে উঠে আসছে জ্যোৎস্না, শীতকালের জ্যোৎস্নার সবটুকু তীব্রতা নিয়ে।

মাকড়সার জালটা যেদিকে উড়ছে, সেদিকে এগিয়ে গেল বাচকুন। বারান্দাটা

যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট্ট একটা ব্যালকনি। সেখান থেকে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যায়। সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার যেন প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। তার চোখের সামনে মহৎ উদ্ভাসনের মতন একটা কিছু ঘটে গেল যেন।

নিবিড় নীল রঙের জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। বিরাট দেবদারু গাছটা সহাস্যমুখে চেয়ে আছে তার দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নালার ওপাশের সেই সুন্দর পবিত্র জায়গাটা। সত্যি ও জায়গাটা যেন কারুর জন্য নয়। ভাগ্যিস তার ঘুম ভেঙে ছিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাচকুন। তার চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে কিংবা দেবকুমারকে ডেকে তুলে এনে দেখাবে? না থাক, ওদের যদি ভালো না লাগে!

বাচকুনের শরীরটা কাঁপলো। তার শীত করছে খুব। পাতলা রাত-পোশাকের ওপর শুধু শাল জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল, পা দুটি হাটু পর্যন্ত নগ্ন। তবু সে ঘরে ফিরে যেতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, যেন আরও কিছু আছে। সে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে আছে দেবদারু গাছটার দিকে।

তারপর একটি পাখি ডেকে উঠলো। প্রথমে আস্তে, তারপর ক্রমশ বেশ জোরে। টিট্রিউ! টিট্রিউ!

বাচকুন অবাক হয়ে গেল। রাত্রে কি পাখি ডাকে? সে তো আগে কোনোদিন শোনে নি! কে যেন বলেছিল, অনেক সময় সাপ গাছ বেয়ে উঠে, পাখির বাসায় ছানা চুরি করতে গেলে পাখিরা ভয় পেয়ে ডেকে ওঠে। কিন্তু শীতে তো সাপ বেরোয় না। কে যেন খানিকক্ষণ আগেই বললো কথাটা। তাছাড়া এ তো ভয় পাওয়া ডাক নয়। এ তো একলা আপন মনে ডেকে ওঠা। ওর মিষ্টি সুরের ঝাপটা ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে। পাখিটা যেন বাচকুনকে শোনাবার জন্যই—

হঠাৎ বাচকুনের শরীরে একটা শিহরণ এসে গেল। প্রতিটি রোমকূপে সে টের পেল এমন একটা কিছুর, যার ঠিক মানে সে জানে না। যেন সব কিছুই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। এই রকম মাঝরাতে সে বারান্দায় এসে জ্যোৎস্নার মধ্যে দেবদারু গাছটার দিকে তাকাবে। দেবদারু গাছটা তাকে একটা পাখির ডাক উপহার দেবে। সেই জন্যই তেসরা ডিসেম্বর সকালে তার মনে পড়েছিল হাজারিবাগের কথা। সেইজন্যই মাঝরাত্তিরে তার ঘুম ভেঙে যাওয়া, সেইজন্যই

মেঘ সরে গেল। এই সব কিছুর মধ্যেই যেন অদৃশ্য পরিকল্পনা আছে, এমনকি মাকড়সার জালও তার মধ্যে আছে। সে পাছে ভুলে যায় তাই মাকড়সার জাল তাকে মনে করিয়ে দিল। এই পাখির ডাক শুধু একা তার জন্য।

সে একদিন হঠাৎ একটা সাংঘাতিক, ভয়াল, দম বন্ধ করা কষ্টের দৃশ্য দেখেছিল পাশের ট্রেনের ছাদে। সেই দৃশ্যটি কি তার প্রাপ্য ছিল? এই কথা ভেবে ভেবে সে যন্ত্রণা পেয়েছে। সেই জন্যই যেন তার বদলে, তাকে কলকাতা থেকে ডেকে এনে, মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে এই অনির্বচনীয় রূপময় ছবিটি দেখানো হলো তাকে।

বাচকুনের চোখে সামান্য জল এসে গেল। এত শীতেও চোখের জল কী গরম। এক আঙুল দিয়ে সে চোখ মুছলো। কেউ বুঝবে না এই চোখের জলের মানে।

এটা কোন্ পাখির ডাক?

স্বর্গ দর্শন

মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। মাথার ওপরে শুধু আকাশ। এতবড় আকাশের নিচে মানুষের নিঃসঙ্গতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পথে পড়ে আছে তাঁর চার ভাই ও স্ত্রীর মৃতদেহ। যুধিষ্ঠির আর পেছন ফিরে তাকালেন না। সঙ্গের কুকুরটি একটু ছটফট করছে। তিনি তাঁর কাঁধের ঝুলি থেকে এক টুকরো পিষ্টকখণ্ড তাকে দিয়ে বললেন, দাঁড়া, আর একটু অপেক্ষা কর।

একটু বাদেই আকাশ থেকে অগ্নিময় শকট নেমে এল। তার থেকে একজন নভোচারী বেরিয়ে আসতেই যুধিষ্ঠির হাঁটু মুড়ে অভিবাদন জানালেন। নভোচারী বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি পৃথিবীর সামান্য মানুষ হলেও তোমার ধৈর্য ও শুভবোধের জন্য তোমাকে আমরা সশরীরে নক্ষত্রলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছি। এসো—!

যুধিষ্ঠির বললেন, আগে এই কুকুরটিকে ভেতরে নিয়ে যান।

নভোচারী একটু অবাক হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, এই সারমেয়টিকে? কেন?

যুধিষ্ঠির নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, সেটাই আমার অভিপ্রায়।

একটুক্ষণ চিন্তা করে নভোচারী হাসলেন। তারপর বললেন, বুঝেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান। তুমি আগে পরীক্ষা করে দেখতে চাও যে আমাদের এই নক্ষত্রযান পৃথিবীর প্রাণীদের উপযোগী কিনা। তোমার আগে জীবিত অবস্থায় কেউ এই যানে চড়ে নি। সেইজন্যই এত দূরের পথ কুকুরটাকে সঙ্গে করে এনেছ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমার সন্দেহ নিরসনের জন্যই ওকে এনেছি। ও যাতে মাঝপথ থেকে চলে না যায়, সেইজন্য মাঝে মাঝে ওকে এক টুকরো করে পিষ্টকখণ্ড ছুঁড়ে দিতে হয়েছে।

নভোচারী আর বাক্যব্যয় না করে কুকুরটিকে নিয়ে যানে চড়লেন এবং মহাশূন্যে উড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

একদণ্ড পর যানটি ফিরে এল, কুকুরটি তার থেকে বেরিয়ে এল লেজ নাড়তে নাড়তে। যুধিষ্ঠির তাঁর ঝুলির বাকি পিষ্টকখণ্ডগুলি সবই কুকুরটিকে দিয়ে বললেন, যাঃ! তুই অনেক উপকার করেছিস আমার। আমি বর দিলাম, এখন থেকে কুকুর মানুষের পোষ্য হবে।

নভোচারী যুধিষ্ঠিরের মাথায় স্বচ্ছ হেলমেট পরিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?

যুধিষ্ঠির বললেন, না।

—তাহলে এস।

যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে স্বর্গীয় রথ উড়ে চলল। যুধিষ্ঠির শেষবারের মতন তাকালেন পৃথিবীর দিকে। তাঁর বুক একটু টনটন করতে লাগল। যদিও আত্মীয়-পরিজন আর কেউই প্রায় বেচে নেই, তবু এই পৃথিবী বড় প্রিয় জায়গা ছিল!

নভোচারী বললেন, তুমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পার। আমাদের পৌঁছেতে দেরি হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, বাইরের এই শোভা তো আর দেখতে পাব না। শুধু শুধু ঘুমিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন?

—তা ঠিক। বৎস, তুমিই এই পৃথিবীর প্রথম নভোচারী। তোমার আগে কারুকে আমরা এই সুযোগ দিই নি। তোমার কীর্তির জন্যই আমরা আর তোমাকে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে দিই নি। তোমার ভয় করছে না?

—ভয়? কেন, ভয় করবে কেন?

—হাজার হোক, আমাদের স্বর্গ নামক গ্রহটি তোমার অচেনা।

—অচেনা হবে কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই সেখানে গেছেন, তাঁরা স্বর্গের গুণকীর্তন করেছেন। আমি সারাজীবন নিজেকে বহুভাবে বঞ্চিত করেও ধর্মপালন করে গেছি স্বর্গে আসবার জন্য। সেখানে যেতে ভয় পাব কেন?

—ভাল কথা! দেখা যাক্!

—আপনি আমাকে প্রথম নভোচারীর সম্মান দিলেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা পুরুরবাও স্বর্গে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এরকম আরও কারুর কারুর কথা জানি।

—অনেকে ওরকম মিথ্যে গল্প করে। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে আগে আনা হয় নি। তোমাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য।

—পরীক্ষা ?

—হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। প্রশ্নটা অতি জটিল, তুমি সব বুঝবে না। তবু সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি। শরীরটা হচ্ছে একটা বস্তু আর প্রাণ হচ্ছে শক্তি। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তবিত করা কিংবা শক্তিকে বস্তুতে—এ কৌশল আমরা জানি, পৃথিবীর মানুষ এখনও জানে না। আমরা পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পর প্রাণগুলো ওপরে নিয়ে আসি। আবাব বস্তুতে রূপান্তর করলেই তারা শরীর ফিরে পায়। তার আগে আমরা তাদের লোভ, মোহ, হিংসা ইত্যাদি পথিবীর বাজে স্বভাবগুলো মুছে দিই। এখন চেষ্টা হচ্ছে, মৃত্যু-টৃত্যুর ঝামেলা না করে যদি তোমার মতন এবকম সশরীরেই নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেও ওই লোভ, মোহ ও হিংসা-টিংসাগুলো মুছে ফেলা যায় কিনা।

যুধিষ্ঠির একটু দুঃখিত হলেন। তারপর হঠাৎ অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন, হে দেব, পৃথিবীতে থাকার সময়েও আমার চরিত্রে কেউ কখনও লোভ, মোহ, মাৎসর্যের চিহ্নমাত্র দেখে নি।

—সেইজন্যই তো তোমাকে বাছা হয়েছে। তবে তুমি যতটা নিজেকে দোষ-শূন্য ভাবছ, ততটা নয়। পৃথিবী গ্রহটাবই কিছু দোষ আছে, তা তোমাকে স্পর্শ কববেই! আমি তো পারতপক্ষে এখানে বেড়াতে আসতেই চাই না। বিষ্ণু মাঝে মাঝে আসেন বটে। পৃথিবীর খবকায় মেয়েদের তাঁর খুব পছন্দ। বেছে বেছে প্রত্যেকবার কি রকম খবকায় সুন্দরীদের বিয়ে করেছেন, দেখেছ ?

দেবতাদের লীলা বিষয়ে যুধিষ্ঠির কোনো মন্তব্য করলেন না। মুখ নিচু করে রইলেন।

মহাশূন্যযানের গতি কমে এসেছে। নভোচারী বললেন, শীগগির! আমরা নরক নামে একটা উপগ্রহে থামব একটুক্ষণের জন্যে। দেখো, ওখানেই যেন থেকে যেতে চেও না। অনেকে আবার ওই জায়গাটাই বেশী পছন্দ করে।

যুধিষ্ঠির সেখানে যান থেকে নামলেনই না। এবং চোখ বুজে রইলেন। তবু অসংখ্য মানুষের চিৎকার ও ডাকে তাঁর কানে প্রায় তালা লাগবার উপক্রম। তিনি দু'হাত দিয়ে কানও চেপে রইলেন।

নরক থেকে স্বর্গ অতি অল্পক্ষণের পথ। স্বর্গে পৌছবার পর নভোচারী বললেন, আমার কর্তব্য এখানেই শেষ। এরপর অন্য বিশেষজ্ঞরা তোমার ভার নেবেন, তা আজ আর কিছু হবে না বোধহয়। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার আর এও শুনে রাখ, এখানে যে কোনো গৃহই তোমার বাসগৃহ, প্রত্যেক

জায়গাতেই খাদ্য আছে, কোনো খাদ্য বা পানীয়ই অপরের নয়, যে কোনো নারীকেও তুমি তোমার বল্লভা হবার জন্য আবেদন জানাতে পার।

যুধিষ্ঠির নেমে রকেট স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। যখন নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, তখন রাস্তা হারাবারও কোনো ভয় নেই। এখানে সব ক'টি পথই সোজা, জটিল গলি-ঘুঁজির অস্তিত্ব নেই, দু'পাশে সারি সারি গাছ, তবে তাদের পাতা সবুজ নয়, নীল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন নীল রং দেবতার এত প্রিয়। চতুর্দিকেই নীলের সমারোহ। যুধিষ্ঠিরের চোখ সবুজ দেখা অভ্যেস বলে একটু একটু পীড়িত বোধ করছিল।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই যুধিষ্ঠির বেশি ব্যগ্র হয়েছিলেন। বিশেষত তিনি দেখা করতে চান পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে। যে-কোনো সংকটে তিনি পিতামহের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। স্বর্গের হাল-চালও পিতামহের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া ভাল।

কিন্তু অদূরেই তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিশাল গাছের নিচে পাথরের লম্বা আসনে বসে আছে দুর্যোধন এবং কর্ণ। যুধিষ্ঠির একটু চমকে উঠলেন। সামান্য বিষাদও অনুভব করলেন। এরা আগে থেকেই এসে স্বর্গসুখ ভোগ করছে? তাঁর আপন ভাইরা এবং পরম আদরণীয়া দ্রৌপদী এখনও এসে পৌঁছয় নি।

ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয় নি। যুধিষ্ঠির ভাবলেন ওদের এড়িয়ে রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে চলে যাবেন। তারপরই চমকে উঠলেন। তিনি কি ওদের ভয় পাচ্ছেন? না ঈর্ষা? কেউ টের পায় নি তো?

তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে এসে কর্ণকে প্রণাম করলেন এবং দুর্যোধনকে স্নেহ সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, তোমার উরুর ব্যথা সেরেছে তো?

ওরা দু'জনেই একটু চমকে উঠেছিলেন প্রথমে। তারপর দুর্যোধন বললেন, কে ধর্মরাজ, এসে গেছ? বাঃ বাঃ। না, ব্যথা-ট্যথা আর কিছু নেই। এখানে ওসব কিছু থাকে না। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা।

কর্ণ নীরব। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠিরের বুক দুরু দুরু করছে। যদিও কর্ণ তাঁর আপন সহোদর দাদা, তবু এ পর্যন্ত তিনি কখনো ওঁর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলেন নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ একবার তাঁকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য যুধিষ্ঠির জানতেন না যে কর্ণ তাঁর দাদা হন। অনেক কটুভাষ্য করেছেন কর্ণের উদ্দেশে তখন।

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে কর্ণের পাদবন্দনা করে বললেন, হে জ্যেষ্ঠ, আপনার কুশল তো ?

কর্ণ দুর্বিনীত এবং কর্কশভাষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল। তিনি যুধিষ্ঠিরের মস্তকের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, হে অনুজ, তোমাকে দেখে আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছি। তুমি পৃথিবীর গৌরব ছিলে এবং এই স্বর্গভূমি তোমাকে পেয়ে গৌরবান্বিত হল।

দুর্যোধন জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মরাজ, তুমি খেয়েছ-টেয়েছ তো? বেরিয়েছ তো সেই কবে! তার ওপর আবার পাহাড় ভেঙে এসেছ। আমরা টেলিভিশনে তোমাদের পাহাড় চড়া দেখছিলাম।

কর্ণ ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ওই দিকে পান্থশালা আছে, তুমি ভোজন সেরে নিতে পার।

দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে বললেন, যা খুশি খেতে পার। এমন রান্না কখনও খাও নি। দাম-টাম কিছু দিতে হবে না।

কর্ণ বললেন, ভাই, পাহাড়-ভাঙার পরিশ্রমে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। যে-কোনো ভবনে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পার।

দুর্যোধন বললেন, পা টিপে দেবার জন্য কিংবা সম্ভোগের জন্য যদি কোনো নারী চাও, দূরভাষণীতে শুধু কার্যালয়ে জানিয়ে দিও। যাকে ইচ্ছে, তাকেই পাবে।

কর্ণ মৃদুহাস্যে বললেন, শুধু উর্বশীকে চেও না। যদিও তিনি চিরযৌবনা এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা -কিন্তু সূর্যবংশের কেউ ওঁকে পাবে না। উনি দাবি করেন, উনি আমাদের সকলের দিদিমা। কারণ সূর্যবংশের পূর্বপুরুষ পুরুরবার উনি বউ ছিলেন কিছুদিন।

যুধিষ্ঠির ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নন। নারী-সঙ্গের জন্যও উন্মুখ নন। তিনি চান আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পেতে।

তিনি বললেন, আপনারা বসুন, আমি আগে একবার পিতামহের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুর্যোধন বললেন, তা যাও। পিতামহ বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এখানে আর তাঁকে জিতেন্দ্রিয় থাকতে হবে না। এখানে তো বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নেই, বাচ্চা-টাচ্চাও হয় না, তাই ওনাকে আর প্রতিজ্ঞা মানতে হবে না।

—পিতামহকে কোথায় পাব ?

—খুঁজে দেখ, পেয়ে যাবে। আমরা এখানে বসে আছি, কারণ শুনছি আজই যাজ্ঞসেনী আসবেন। তাঁকে দেখব বলেই তো

যুধিষ্ঠির চমকে উঠলেন। দ্রৌপদী আসবেন! তা তো ঠিকই। মধুরহাসিনী দ্রুপদ-তনয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে আসবার অধিকারিণী!

দুর্যোধন বললেন, অন্য কেউ দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করার আগেই আমার আবেদনটা জানিয়ে রাখব। দ্রৌপদীকে পাওয়ার সাধ আমার বহুদিনের। জুয়া খেলায় ওকে তো জিতেই নিয়েছিলাম, তবু বাবার বকুনি খেয়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিতে হল। ওর জন্য এতবড় যুদ্ধটা করলাম। এখন আর মনে কোনো রাগ নেই। পরম রমণীয়া দ্রৌপদীকে আমি সপ্রেমে কোলে বসাব।

যুধিষ্ঠিরের মনে হল, তাঁর সর্বাঙ্গে যেন ক্ষত, সেখানে কেউ নুনের ছিটে দিচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে হল ছুটে এখান থেকে চলে যান। চাই না স্বর্গ। দ্রৌপদীকেও তিনি পথে আটকাবেন।

দুর্যোধন আপন মনে অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্ণের দিকে চোখ পড়ায় থেমে গেলেন। লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলেন এবং কান মুললেন। তারপর বললেন, না, না, আমি প্রথম না, আমি দ্বিতীয়। দ্রৌপদীর ওপর সর্বাগ্রে অধিকার মহাত্মা কর্ণের। দ্রুপদ রাজার স্বয়ংবর সভায় আমরা কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারি নি বটে, কিন্তু মহাধনুর্ধর কর্ণের কাছে ও তো ছেলেখেলা! অর্জুনের অনেক আগেই কর্ণ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হল না। ইনি স্বয়ং সূর্যের পুত্র, রাজমাতা কুন্তী এঁর জননী, অর্থাৎ মহাক্ষত্রিয়, অথচ এঁকেই সূতপুত্র বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন। সেই মিথ্যের আজ অবসান হবে। স্বর্গে মিথ্যের কোনো স্থান নেই।

কর্ণ কোনো কথা না বলে মৃদু মৃদু হাসছেন। যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত, নির্বাক। তাঁর মস্তিষ্ক মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাবার মতন অবস্থা। যে দ্রৌপদীর জন্য তাঁরা পাঁচ ভাই এত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেই দ্রৌপদী আজ দুরাত্মা দুর্যোধনের অঙ্কশায়িনী হবে! এবং কর্ণ? দাদা হয়েও তিনি ছোটভাইদের স্ত্রীকে কামনা করবেন!

যুধিষ্ঠির আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দু'একটি শুকনো ভদ্রতার কথা বলে বিদায় নিলেন তাড়াতাড়ি। আর একটু হলে তাঁর ক্রোধের প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। কিংবা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা আজ আসবে না, সে এখনও মরে নি। মিথ্যে কথা! কিংবা পুরো মিথ্যে নয়, দ্রৌপদীর আর এক নাম কৃষ্ণা হলেও ওই নামে আরও অনেক নারী আছে পৃথিবীতে। রথচালক বাহ্লিক-

এর স্ত্রীর নামই তো কৃষ্ণা, সে এখনও বেঁচে। অর্থাৎ ইতি গজের মতন ব্যাপার। কিন্তু স্বর্গে এসেও মিথ্যের ছলনা!

যুধিষ্ঠির বেশী দূর যেতে পারলেন না। পিছন দিকটা তাঁকে চুম্বকের মতন টানছে। পিতামহ কিংবা অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পরে দেখা করলেও হবে। তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। দ্রৌপদীকে যদি আগে থেকেই কোনোক্রমে সতর্ক করে দেওয়া যায়!

তাঁর খুব আশা হল, দ্রৌপদীর আগেই ভীম বা অর্জুন এসে পড়তে পারে। তখন দেখা যাবে! ভীমার্জুনের কাছ থেকে দ্রৌপদীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া দুর্যোধন-কর্ণের সাধ্য নয়। কিন্তু যদি ওরা আগে না আসে! অর্জুনটা তো আবার অতি ভদ্র কিনা। নরক থেকে স্বর্গে যখন রথ আসবে, তখন অর্জুন হয়তো বলবে, মহিলারই অগ্রাধিকার, দ্রৌপদীই আগে যাক।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন, এটা তাঁর ঈর্ষা। প্রথমেই এরকম কঠিন পরীক্ষায় পড়বেন, তিনি ভাবতেই পারেন নি। শুধু ঈর্ষা নয়, স্বর্গে এসে তিনি যুদ্ধেরও চিন্তা করছেন। তিনি ভাবছেন দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করে আবার ভীমার্জুন আর দুর্যোধন-কর্ণের একটা লড়াই বাধাবেন। ছিঃ ছিঃ! আত্মগ্লানিতে যুধিষ্ঠিরের মন ভরে গেল। তিনি গাছতলায় বসে পড়ে চোখ বুজে চিত্তশুদ্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে দ্রৌপদীর মুখ। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে দ্রৌপদী যখন ঢলে পড়েছিলেন, তখন তিনি তাকে তোলার চেষ্টা করেন নি। পাথরের ওপর সেই রাজনন্দিনীর কোমল তনু না জানি কত ব্যথা পেয়েছে! মৃত্যুর আগে দ্রৌপদী জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহারাজ, কোন্ পাপে আমি এইভাবে মৃত্যুবরণ করছি? তিনি বলেছিলেন, তোমার কাছে তোমার পাঁচ স্বামীই সমান, তবু তুমি অর্জুনকে বেশী ভালবাসতে।

এই কথাটা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে কি একটু শ্লেষ ফুটে উঠেছিল? তিনি বহুদিন ধরেই জানতেন যে দ্রৌপদী অর্জুনকেই বেশী ভালবাসে—তবু কোনো দিন মুখ ফুটে বলেন নি। এই জন্য তাঁর মনের মধ্যে একটা কাঁটা ছিল। তিনি কি এজন্য অর্জুনকেও হিংসে করতেন? না, না, না, তা হতেই পারে না! অর্জুন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে? না, দ্রৌপদীর চেয়ে বেশী নয়। দ্রৌপদীর মন পাবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গায়ের জোর বা

বীরত্বের দিকেই দ্রৌপদীর ঝোঁক বেশী। মেয়েদের এই এক দোষ। তাঁর যে এত শাস্ত্রজ্ঞান, এত ধর্মবোধ—এসব দ্রৌপদী বেশী পাত্তাই দেয় নি কখনও। ব্যাসদেব যখন এসে বলেছিলেন, এক বউকে নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের যাতে মনোমালিন্য না হয় সেই জন্য তোমরা প্রত্যেকে একটা করে দিন ঠিক করে নাও, সেইদিন অন্য কেউ আর তার কাছে যাবে না—তখন যুধিষ্ঠির নিজের জন্য রবিবারটা ঠিক করে নিয়েছিলেন আগেই। রবিবারে কোনো রাজকার্য থাকে না, সারাদিন অখণ্ড অবসর। সারাদিন ধরে তিনি দ্রৌপদীকে পেতেন। অন্য ভাইদের অন্যান্য দিন শাসনকার্যের জন্য বেশ কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করতেই হতই। একবার তিনি যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে রতিক্রীড়া করছিলেন, তখন অর্জুন হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এজন্য অর্জুনকে এক বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল। তিনি তখন মুখে অনেকবার তাকে নিষেধ করলেও মনে মনে খুশী হয়েছিলেন একটু। সেই এক বছরটা দ্রৌপদীকে বেশী করে পাওয়া গিয়েছিল।

হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের ঘোর ভেঙে গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাকিয়ে দেখলেন দূরে দ্রৌপদী আসছেন, একা। দুর্যোধন আর কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করছেন। যুধিষ্ঠির হাত নেড়ে দ্রৌপদীকে ইশারা করতে লাগলেন, যাতে তাড়াতাড়ি এইদিকে চলে আসে। কিন্তু দ্রৌপদী দেখতেই পেলেন না। দ্রৌপদী যেন আরও বেশী রূপসী হয়েছেন। বয়সের কোনো ছাপ নেই। চিক্কণ মসৃণ ত্বক। কোমর পর্যন্ত ছড়ানো চুল। সুগোল বর্তুল দুই স্তন। সিংহের মতন সরু কোমর। গুরু নিতম্ব। দ্রৌপদীর দাঁত এত সুন্দর যে হাসলেই মনে হয় যেন চারদিকটা আলো হয়ে গেল। তাঁর ওষ্ঠ ও অধর পাকা আঙুর ফলের মতন।

যুধিষ্ঠির দেখলেন, কর্ণ ও দুর্যোধন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন দ্রৌপদীর দিকে। তিনি শুনতে পেলেন, কর্ণ বলছেন, হে বরবর্ণিনী, তোমার আগমনে সুরলোক ধন্য হল। আমরা তোমার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম। হে সুন্দরী, তোমার রূপের ছটায় আমি বিমোহিত। তোমার তুল্যা মোহময়ী নারী আমি দুই জীবনে দেখি নি!

দ্রৌপদী মধুর হাস্যে বললেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কথা আমার কানে সুধাবর্ষণ করছে। আপনার মতন তেজোদ্দীপ্ত পুরুষের সামনে দাঁড়ালেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

দুর্যোধন বললেন, হে যাজ্ঞসেনী, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না নাকি? আমিও তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি যে—

দ্রৌপদী বললেন, হে সখা, তোমাকে দেখব না কেন? তোমার ওই সহাস্য সুন্দর মুখ কোনো নারী কি না দেখে থাকতে পারে?

যুধিষ্ঠির বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলেন। জন্ম-শত্রুদের সঙ্গে দ্রৌপদী এরকম আদুরে আদুরে ভাবে কথা বলছে কেন? সে কি ঘৃণাভরে ওদের এড়িয়ে চলে আসতে পারত না?

তারপরেই সেই নভোচারী দেবতার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রৌপদী—ওরা তিনজনেই মৃত্যুর পর স্বর্গে এসেছে। তাই শরীর থেকে রাগ, হিংসা, দ্বেষ সব মুছে দেওয়া হয়েছে। চিরকালের আনন্দ ও সম্ভোগসুখেই ওরা নিমজ্জিত থাকবে শুধু।

দুর্যোধন বললেন, হে দ্রুপদ-নন্দিনী, তোমাকে দেখে আমরা অধীর হয়েছি। রাজসভায় তোমাকে একদিন আমার উরু প্রদর্শন করে বলেছিলাম, তোমাকে এইখানে এসে বসতে হবে। কিন্তু তখন সে কার্যে সক্ষম হই নি। কিন্তু তখন থেকেই আমার সেই বাসনা রয়ে গেছে। এবার কি তুমি একবার সেখানে এসে বসবে?

দ্রৌপদী বললেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। এখনি!

দুর্যোধন বললেন, এখনি নয়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণও তোমার প্রার্থী। এবং একথা কে না জানে, তোমার প্রতি কর্ণের প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। তুমি যতকাল ইচ্ছা কর্ণের সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ কর—আমি প্রতীক্ষায় থাকব। স্বর্গে কোনো নারীই উচ্ছিষ্টা নয়। এখানে অমৃত এবং নারী সমতুল্য।

দ্রৌপদী কর্ণের দিকে ফিরে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন, হে সূর্যপুত্র, এই দেখুন, আপনার সন্দর্শনেই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমি বহুকাল ধরেই মনে মনে আপনাকে কামনা করেছি। আপনি আমাকে ধন্য করুন।

দ্রৌপদী নিজেই কর্ণের প্রশস্ত বক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজের বক্ষদ্বয় কর্ণের শরীরে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে ব্যগ্র মুখখানি তুললেন ওপরের দিকে। তারপর তাঁর পাকা আঙুরের মতন অধর ডুবে গেল কর্ণের ওষ্ঠের মধ্যে।

যুধিষ্ঠির আর দেখতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি চোখ ঢাকলেন। স্বর্গে এসে তাঁর এ-কি বিরাট পরাজয় হল! তিনি পারলেন না। ক্রোধে কম্পিত হচ্ছে তাঁর শরীর, বুকের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছে হিংসা। দেবতারা কি এই অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলেছেন? দেখুক!

নিতান্ত পৃথিবীর মানুষের মতন যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়ে টপ টপ করে কান্না ঝরে পড়তে লাগল।

ছদ্মবেশে

নদীটা এমন সুন্দর যে দেখলেই প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে করে। খুবই ছোট নদী, এক হাঁটু বা এক কোমরের বেশী জল হবে না। তবে অনেক বড় নদীতে যেমন অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকে, মাঝখান দিয়ে জল যায়, এ নদীটা সে রকম নয়। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চাঙাড় পড়ে আছে। প্যান্ট ভিজিয়েই আমি নদীর মধ্য দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর উঠে বসলাম।

দু'পাশে হালকা জঙ্গল। ডাকবাংলো প্রায় দু'মাইল দূরে। সকালবেলা সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে যে এমন চমৎকার একটা নদী পেয়ে যাব, ভাবি নি। নদীটা যেন বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আমিই যেন একে প্রথম আবিষ্কার করলাম।

এই জঙ্গলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই। ডাকবাংলোর চৌকিদারকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। আমাদের পাশের ঘরে যে চারটি যুবক এসেছে, তাদেরও খুব আগ্রহ। তাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। কিন্তু চৌকিদার নিরাশ করে দিয়েছে একেবারে। অনেককাল আগে নাকি এখানে কিছু হরিণ আর ভাল্লুক দেখা যেত, এখন সব উজাড় হয়ে গেছে। কয়েকটা শেয়ালের ডাক শুধু শোনা যায়।

পাথরটার ওপর বসে আমার মনে হল, এই সময় কোনো জন্তু যদি জল খেতে আসত এই নদীতে, তাহলে দৃশ্যটা আরও কত সুন্দর হতে পারত। একটা দুটো শেয়াল এলেও চলত। কিন্তু শেয়ালরা দারুণ ভীতু হয়।

মেঘলা মেঘলা দিন। মোলায়েম হাওয়া দিচ্ছে। এই সময় আরও কেউ থাকলে ভাল হত। ডাকবাংলো থেকে আমাকে প্রায় পালিয়ে আসতে হয়েছে। পাশের ঘরের চারটি ছেলের মধ্যে একজন আমাকে চিনে ফেলেছে। তার বোধহয় কবিতা লেখার বাতিক আছে, অনবরত আমার সঙ্গে সেই কথা বলতে চায়। সকালবেলা সাহিত্য-আলোচনা আমার একটুও ভাল লাগত না।

জঙ্গলের মধ্যে খচমচ শব্দ শুনে আমি চমকে তাকালাম। না। কোনো জন্তু

জানোয়ার নয়। দুটো বাচ্চা ছেলে। তাদের পেছনে পেছনে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক।

কালো চেহারার ছেলে দুটো এসেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দাপাদাপি করতে লাগল মনের আনন্দে। কাছেই নিশ্চয়ই বাড়ি-ঘর আছে। তা তো থাকবেই, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার নেই এখন। কিংবা মানুষরা এসেই জন্তু-জানোয়ারদের মেরে শেষ করেছে। কত জঙ্গল ঘুরে বেড়ালাম, আজ পর্যন্ত একটা ভাল্লুক কিংবা বাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম না। হাতি দেখেছি অবশ্য, অনেক, তবে উত্তর বাংলায়, বিহারে দেখি নি।

ছেলেগুলোকে দেখে আমার হিংসে হয়। বাড়ির কাছেই নদী, এই সুযোগ তো আমার ছেলেবেলায় পাই নি। জল বেশী নেই, সুতরাং ডুবে যাবারও ভয় নেই। সামান্য স্রোত আছে। টলটলে পরিষ্কার জল।

স্ত্রীলোকটি কাপড় কাচতে এসেছে। আমার দিকে কয়েকবার তাকাল বিস্মিত-ভাবে। আমি ঠিক নদীর মাঝখানে বসে আছি, একজন প্যাণ্ট-শার্ট পরা বাবু, এরকম বোধহয় সহজে দেখা যায় না।

এমন সুন্দর নদীর জলে জামাকাপড় কেচে নোংরা করার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না। অবশ্য ওরা তো বুঝবে না। ওরা তো সৌন্দর্যের কথা ভাবে না, ওদের কাছে নদী একটা প্রয়োজনের জিনিস।

চটিজোড়া খুলে রেখে আমি জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দিলাম। বেশ ঠাণ্ডা জল। নদীর গায়ে পা দিয়েছি বলে নদী কি রাগ করবে? স্নান করার সময়ও তো পা ডোবাতে হয়। নদীটিকে সত্যিই যেন একটি যুবতী মেয়ের মতন মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যায় না। আমি পা তুলে নিলাম।

খানিকটা বাদে স্ত্রীলোকটি কাপড় কাচা শেষ হতেই বাচ্চা দুটোকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ছেলে দুটো স্রোতের মধ্যে খেলা করতে করতে অনেক দূরে চলে গেছে। আবার ফিরে এল। তারপর নদী থেকে উঠে গায়ের জল না মুছে দৌড় দিল জঙ্গলের মধ্যে।

আবার নদীটা ফাঁকা। আমি ছাড়া কেউ নেই। একটা কাঠঠোকরা পাখি কোথায় যেন ঠকঠক শব্দ করে যাচ্ছে। অনেক দূরে একটা ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রেললাইন গেছে।

আমি বসেই রইলাম। বেশ নেশার মত ভাব লাগল বসে থাকতে থাকতে। খুব খিদে না পেলে এখান থেকে ওঠা হবে না।

একটু বাদে আমার মনে হল, কাছেই যখন বাড়ি আছে, তখন একটি মেয়ে একা এখানে আসতে পারে না? তা হলে বেশ হত। জঙ্গলের মধ্যে এরকম নিরিবিলি নদীর পাশে একটি যুবতী মেয়ে না থাকলে যেন মানায় না। ' কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি সব পাওয়া যায়। আমাব দেখতে ইচ্ছে কবছে বলেই কি আকাশ থেকে কোনো মেয়ে নেমে আসবে।

আসতেও তো পারে! পরী কিংবা অপ্সরারা কি সব শেষ হয়ে গেছে? তাবা এই পৃথিবীতে আর আসে না? এরকম নির্জন নদীতীরেই তো তাদের দেখতে পাওয়ার কথা। যদি খুব মন দিয়ে ডাকি!

সত্যিই, ধ্যান করার মতন আমি একটি মেয়ের কথা খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। কোনো চেনা মেয়ের মুখ আমার মনে এল না, আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন মেয়ে তৈরি করে নিলাম। নদীর মাঝখানে পাথরের চাঁইয়ের ওপর আমি ধ্যানী হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

তারপর আমাব ধ্যানের সাড়া মিলল। বনপথ দিয়ে হেঁটে সত্যি মেয়ে এল, তবে একজন না, একসঙ্গে তিনজন।

তিনটি আদিবাসী মেয়ে কলকল করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল নদীর ধারে। তাদের কাঁখে কলসী। আমাকে তারা লক্ষ্যই করে নি, নদীব তীরে কলসী নামিয়ে বসল। এরাও তো অপ্সরা হতে পারে! অপ্সরা কি কালো রঙের হতে পারে না?

নদীর মাঝখানে পাথরের ওপর কোনো লোক বসে থাকবে, এটা তাদের মাথাতেই আসে নি। তাই নিশ্চিন্তে তারা জামা খুলতে লাগল।

আমি লজ্জায় পড়লাম। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। একটা শব্দ করলাম মুখ দিয়ে।

মেয়ে তিনটি চমকে তাকাল আমার দিকে। দু'জন তখন জলে নেমেছে, একজন পাড়ে দাঁড়িয়ে—তিনজনেই তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ফিরে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল একটু, একটু যেন বিরক্তির স্বর তাদের গলায়। তারপর তারা একটুখানি সরে গেল জঙ্গলের দিকে, যদিও কলসীগুলো পড়ে রইল সেখানেই।

আমার অস্বস্তি লাগতে লাগল। মেয়েগুলি নিরিবিলিতে এখানে স্নান করতে এসেছিল, রোজই বোধহয় আসে—আমাকে দেখে ওরা বিরক্ত হয়েছে। আমিই বা কেন ওদের বাধার সৃষ্টি করব?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। এই যে, শোন, আমি চলে যাচ্ছি। ওরা কোনো উত্তর দিল না। আমি পাথর থেকে নামলাম। জল ভেঙে ভেঙে এগোলাম পারের দিকে। প্যান্টটা পুরোটাই ভিজে গেল। আমিও এখানে স্নান করে নিতে পারতাম। ভিজে প্যান্ট-শার্ট নিয়েই ফিরে যেতাম ডাকবাংলোয়। ইস্, কেন যে আগে স্নান করে নিই নি। মেয়েগুলোর সামনে এখন আমার স্নান করতে লজ্জা করবে।

আমার নিয়তি তখন আমার সঙ্গে একটু কৌতুক করতে চাইল। পরক্ষণেই একটা আলগা পাথরের ওপর পা ফেলে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম জলের মধ্যে। চশমাটাও খসে পড়ল।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়ে তিনটি। আমার তখন, যাকে বলে, নাকানি-চোবানি খাওয়ার মতন অবস্থা। জলের তলায় হাতড়ে চশমাটা খুঁজতে লাগলাম। মেয়ে তিনটি হেসে চলেছে।

চশমাটা পেয়ে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। এরকম পরিস্থিতিতে রেগে যাওয়া আরও বোকামির কাজ, আমি মুখটাকে হাসি হাসি করে রেখে উঠে এলাম। সারা গা দিয়ে জল পড়ছে। মাথাটাও ভিজে গেছে।

হাস্যমুখী তরুণী তিনটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমরা তো আগে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলে, এখন হাসছ যে বড় ?

একটি মেয়ে বলল, তুমি ওখানে কি করছিলে ?

—এমনিই বসে ছিলাম।

—কেন ? বসেছিলে কেন ?

—আমার তো পৃথিবীতে কেউ নেই ! কোথায় আর যাব ! তাই ওখানে বসেছিলাম।

একটা সুবিধে এই, এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের জন্য কোনো ভূমিকার দরকার হয় না। প্রথম আলাপেই এরা 'তুমি' বলে।

—তাহলে চলে যাচ্ছ কেন ?

আমি মাথা থেকে খানিকটা জল নিংড়ে বললাম, আমার জন্য তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল তো !

ওরা একটু অবাকভাবে তাকাল। বোধহয় 'অসুবিধে' কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। একজন তার হাতের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, মাথা মুছে নাও না !

অন্য কারুর গামছা এভাবে ব্যবহার করার কথা আগে কখনো চিন্তাও করি নি। এখন আর দ্বিধা করলাম না। গামছাটা নিয়ে মাথা মুছে ফেললাম।

সেই মেয়েটি আবার নরমভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার কেউ নেই কেন?

—কি জানি! আমার মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, বউ নেই, কেউ নেই!

— তুমি কি কর?

—কিছুই করি না। গান গাই, ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

ওরা তিনজনেই বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমিও যে কেন এই সব কথা বানাচ্ছি, তাও জানি না তবে বেশ ভাল লাগছে।

কারুকে অবাক করে দিতে ভাল লাগে না।

ওরা আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলে। প্যান্ট-শার্ট পরা কোনো বাবুর মুখে এরকম কথা আশা করে নি। ওদের ধারণা বাবুদের সব থাকে, এমন কি তাদের মা বাবারাও বেশীদিন বেঁচে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা আর কথা বলছে না দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নদীটার নাম কি?

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল, অর্থাৎ নদীর নাম জানে না। এরকম আগেও দেখেছি, স্থানীয় লোকেরা নদীর নাম নিয়ে মাথা ঘামায় না। ম্যাপেও এইসব নদীর নাম থাকে না।

—তোমাদের নাম কি?

ওরা এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়ে ফিকফিকিয়ে হাসতে লাগল। নাম বলতে লজ্জা।

—কি গো, তোমাদের নাম নেই?

আবার সেই রকম হাসি। তিন-চারবার প্রশ্ন করেও ওদের নাম উদ্ধার করা গেল না। এ ওকে ঠ্যালা মারে, কেউ প্রথমে বলবে না।

অপ্সরাদের কি নাম থাকে? এদেরও সেই রকম নেই বোধহয়। আমি মনে মনে ওদের নাম দিলাম প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া।

আমি ঘাড় হেলিয়ে বললাম, চলি!

তৃতীয়া বলল, গান শুনালে না?

যেন অনেক আগে থেকেই ওদের কাছে আমার গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। এমন মজার সুরে কথা বলে।

—কেন ? গান শোনাব কেন ?

—তুমি যে বললে গান গাও।

—তা গাই। কিন্তু গান শোনালে তোমরা পয়সা দেবে ?

ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। প্রথমা বেশ রাগের সঙ্গেই বলল, পয়সা আমরা কোথায় পাব ? বাবুদের কি আমরা পয়সা দিতে পারি ? বাবুরাই তো পয়সা দেয়।

—আমি তো সেই রকম বাবু নই। গরীব বাবু। আমি ভিখিরী।

—মিছে কথা।

—না, মিছে কথা না। সত্যি। আচ্ছা পয়সা দিতে হবে না। গান শোনালে খেতে দেবে ? তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে ?

—আমাদের বাড়িতে তোমরা কি খাবে ?

—যা দেবে। মুড়ি, কলা, চিঁড়ে, পেয়ারা, আতা, পান্তাভাত।

—মুড়ি খাবে ? তো মুড়ি দেব।

—খুব ভাল। সঙ্গে দুটো কাঁচালঙ্কা দিও। এখন গান শুনবে ? না বাড়িতে গিয়ে ?

—এখন।

আমি একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। এদের সামনে গান গাইবার জন্য লজ্জা পাবার দরকার নেই। গানের ওস্তাদ না হলেও চলে। ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, 'আগডালে বসা কোকিল, মাঝ ডালে বাসা রে' গানটা অনেকটা সাওতালি গানের ধরনের। সেইটাই গাইতে শুরু করলাম। ওরা চুপ করে শুনে গেল, মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। বুঝতেও পারলাম না, খারাপ লাগল না ভাল লাগল।

গান শেষ করার পরেও ওরা চুপ। আমি বললাম, কি, এই গানের জন্য কি মুড়ি খেতে পাব ?

ওরা কোনো উত্তর দিল না।

—আর একটা গান গাইব ?

আমার এ প্রশ্ন শুনে তিনজনেই মাথা হেলাল। আমি নিজেই যেচে যেচে গান শোনাতে চাইছি। এমন শ্রোতা কোথায় পাব ? নিরালা নদীর ধারে তিনজন যুবতীকে গান শোনাবার সুযোগ ক'জনে পায় ? কলকাতায় আমি বাথরুমেও বেশী জোরে গলা খোলার সাহস পাই না।

এবার ধরলাম, 'ওগো সুন্দরী, তুমি কার কথায় করেছ মন ভারী—'। এটা শুনে ওরা বেশ হাসতে লাগল। এ গানটা বেশ পছন্দ হয়েছে। ওগো সুন্দরী, বলে এক একজনের মুখের দিকে তাকাই, অমনি সে মুখ লুকোয়। এমন সরল লাজুকতা কখনো দেখি নি আগে।

আরও চার-পাঁচটা গান গাইলাম। তারপর বললাম, আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।

ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, তোমরা স্নান সেরে নাও—আমি একটু অপেক্ষা করছি।

আমি খানিকটা দূরে গিয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রইলাম। পকেটের সিগারেট-দেশলাই সব ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং সময় কাটাবার জন্য গাছের পাতায় নখ দিয়ে ছবি আঁকতে লাগলাম।

মেয়ে তিনটি স্নান সেরে কলসীতে জল নিয়ে ফিরে এল। ওদের তিনজনেরই ভিজে কাপড়। আমারও ভিজে প্যান্ট-শার্ট। আমি বললাম, আর থাকতে পারছি না এত খিদে পেয়েছে।

আমরা প্রায় দৌড়তে লাগলাম।

ওদিকে ডাকবাংলোতে এতক্ষণে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেছে। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। এদিকে আমি ভিজে গায়ে তিনটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে মুড়ি খাওয়ার লোভে দৌড়চ্ছি। এখানে আমার নাম সুনীল নয়, আমি লেখক নই, আমি এখন এই পৃথিবীতে একজন অনাথা সঙ্গীহীন মানুষ। পরিচয় বদলাবার এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আমাকে ঘিরে থাকে।

একবার আমার মনে হয়, এই মেয়ে তিনটি সত্যিই অপ্সরা নয় তো? হঠাৎ কি অদৃশ্য হয়ে যাবে? তা হলে সে দুঃখ আমি রাখব কোথায়? ওদের বাড়ির মাটির দাওয়ায় বসে পেতলের বাটিতে মুড়ি খাওয়ার জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করে। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না। দৌড়তে দৌড়তে আমি বলি, আরও জোরে। আরও জোরে। ওদের কলসী থেকে জল ছলাৎ ছলাৎ করে পড়ে, সেই রকম শব্দেই ওরা হাসে। অরণ্যের মধ্যে সমস্ত দৃশ্যটা স্বপ্নের মতই হয়ে যায়।

নদীর দু'তীর

তখন থেকে ডাকা হচ্ছে স্বপ্নাকে, কোনো সাড়া নেই। সে তখন আয়নার সামনে বিভোর। কাল রাত্রিরে কিনে আনা হয়েছে আকাশী নীল রঙের অরগানজা শাড়িটা, রাত্রিরেই সেটা একবার পরেছিল স্বপ্না। সকালে উঠে আবার শাড়িটা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। আটপৌরে শাড়ির ওপরেই সেটা কোনোক্রমে জড়িয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। তার সতেরো বছরের শরীর যেন এখন অনেক পাকা হয়ে গেছে। এখন সে অনায়াসেই উড়ে যেতে পারে।

বন্দনা দরজার কাছে উঁকি দিয়ে মেয়েকে দেখে রাগ করার বদলে হেসে ফেলল। তবু মৃদু ধমক দেবার সুরে বলল, এই এখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

স্বপ্না ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, কি?

তুই চান করতে যাবি না? সাড়ে ন'টা বেজে গেল।

শাড়িটা পাট করতে করতে স্বপ্না বলল, মা আজ এটা পরে কলেজে যাব?

বন্দনা বললে, না না, আজ পরিস না। পরশুদিন তোর জন্মদিন। সেইদিন নতুন শাড়ি পরতে হবে না। আজই পুরো না করে ফেলবি নাকি?

বড্ড ইচ্ছে করছে যে।

আজ আমার মেরুন শাড়িটা পরে যা। ওতেও তোকে ভাল মানায়। চট-পট চান করে নে।

আমি এক ঘণ্টা পরে বেরুব। আমার তো আজ বারোটায় ক্লাস।

একটু বাদে বন্দনা যখন স্নান সেরে এল তখনও স্বপ্না আয়নার কাছে। কিছুদিন ধরে এই হয়েছে মেয়ের এক রোগ, আয়নার কাছে থেকে আর নড়ে না। দরজা বন্ধ করে এসে বন্দনা বলল, এবার সর, আমি কি চুল টুল আঁচড়াব না?

বন্দনার মুখে এখনও বিন্দু বিন্দু জল লেগে আছে। বাথরুম থেকে শুধু পরে এসেছে। এখন আলনা থেকে লাল ব্লাউজটা নিয়ে পরতে লাগল। আঁচল খসে গেল পিঠ থেকে। মেয়ের থেকে বন্দনা বেশী ফর্সা। তার চওড়া পিঠ,

কোমর এখনো সরু। একটু সরে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। মায়ের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তোমার ফিগারটা এখনো কী সুন্দর!

বুড়ী হয়ে গেছি, এখন আবার ফিগার।

মোটেই তুমি বুড়ী হও নি! কে তোমাকে বুড়ী বলে!

বুড়ী হব না? এখন থেকেই তো মেয়ের বিয়ের চিন্তা করতে হবে।

আহা, তোমার যেন ঘুম হচ্ছে না!

বন্দনা আর পরিতোষ একসঙ্গে অফিসে যায়। পরিতোষ এর মধ্যে খেতে বসে গেছে। বন্দনা তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম ঘষে চলে এল খাওয়ার ঘরে। ঠাকুরই খাবার পরিবেশন করে, তবে বড় বড় মাছের টুকরোগুলো বন্দনাই জোর করে পরিতোষকে খাওয়ায়। পেটের গণ্ডগোলটা শুরু হবার পর পরিতোষের চেহারাটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। বয়সের তুলনায় তাকে বয়স্ক দেখায়।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করল, স্বপ্নার এখনো হল না!

ওর আজ দেরিতে ক্লাস।

খেয়ে-দেয়ে স্বামী-স্ত্রী যখন বেরুচ্ছে, তখনও স্বপ্না বাথরুমে গান গাইছে গুন-গুন করে। ছোট ছেলের ইস্কুল অনেক সকালেই। যাবার সময় বন্দনা চেঁচিয়ে বলে গেল, স্বপ্না তুই চারটের মধ্যে ফিরবি তো? দেখিস খোকন যেন খেয়ে নেয়।

বাড়ি থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত তিন মিনিটের পথ। ঠিক মোড়ের মাথায় এক দঙ্গল ছেলে রোজই দাঁড়িয়ে থাকে। এরা বেকার। যদিও জামা-কাপড় ফিটফাট, সব সময় হাতে সিগারেট। বন্দনা এই জায়গাটুকু মুখ নিচু করে থাকে। ছেলেগুলো একেবারে রাক্ষসের মতন তাকায়। মাঝে মাঝে বাঁকা বাঁকা মন্তব্যও করে। কত অনায়াসে উচ্চারণ করে অসভ্য কথা। পরিতোষ আজকাল সব সময় চিন্তিত থাকে, সে এসব কিছু লক্ষ্য করে না। যতক্ষণ না মিনিবাস আসে, ততক্ষণ অস্বস্তি হয় বন্দনার।

যদিও অফিস যায় একসঙ্গে। কিন্তু একসঙ্গে ফেরা হয় না। পরিতোষকে অনেক বেশীক্ষণ থাকতে হয়। তাছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আছে। বন্দনা অফিস থেকে বেরোয় কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়।

বাবা মা বেরুবার একটু বাদে স্বপ্না বেরুল। মোড়ের মাথায় তখনো সেই ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্না কিন্তু মুখ নিচু করে না। সোজা গটগটিয়ে হেটে এসে দাঁড়ায় ট্রামের জন্যে। সেই ট্রামেই দু'স্টপ পরে লাফিয়ে ওঠে আর

একটি ছেলে। এর নাম গৌতম। সে স্বপ্নার পাশে এসে দাঁড়ায়। এবং কণ্ডাকটারকে দেখে স্বপ্না পয়সা বার করতে গেলেই গৌতম তার আগেই একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুখানা।

স্বপ্না ভুরু কুঁচকে বলে, আপনি আবার আজ আমার টিকিট কাটছেন!

অফিসে বন্দনার কাজের চাপ খুব বেশী নয়। কাজে ফাঁকি না দিয়ে গল্প করার সময় পাওয়া যায়। আরও চারটে মেয়ে আছে অফিসে। তাদের মধ্যে দুজন বন্দনাকে খুব হিংসে করে। এমনিতে কোনো কারণ নেই হিংসে করার, চারজনের একই পোস্ট, একই মাইনে, কিন্তু বন্দনা কেন বেশী সুন্দরী! কেন তার বয়েস বোঝা যায় না? কেন সে সাজে, কেন হাত-কাটা ব্লাউজ পরে?

মাঝে মাঝে পাশের অফিস থেকে বিদ্যুৎ আসে আড্ডা মারতে। বিদ্যুৎ পরিতোষের বন্ধু। বিরাট লম্বা লম্বা চুল রেখেছে, মাঝে মাঝেই আঙুল দিয়ে চিরুনির মতন আঁচড়ায়। বন্দনার ঘরে এসে টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারটায় ঝপাং করে বসে পড়ে বলে, তোমাদের এখানটায় বেশ হাওয়া আছে। জানলা দিয়ে বাইরের মাঠ দেখা যায়।

বিদ্যুতের অফিসের ঘর এয়ার-কণ্ডিশান্ড, সেইজন্যেই বোধহয় সে মাঝে মাঝে এখানে হাওয়া খেতে আসে। এবং নির্লজ্জ চোখে বন্দনার যৌবনের তারিফ করে।

বিদ্যুৎ এমন একটি দুর্জন, যাকে ভাল না লেগেও উপায় নেই। বিয়ে করে নি, বহু মহিলার সঙ্গে তার সংসর্গ বহুবিদিত। সে খুব সুন্দর কথা বলতে পারে, সাধারণভাবে মহিলাদের স্তাবকতা নয় তার কথার মধ্যে গভীরতা আছে। সে সত্যিকারের জ্ঞানী লোক, কিন্তু লোকে যাকে 'চরিত্র' বলে, সেটা বেশ দুর্বল।

পরিতোষ কেমন আছে? ভুগছে এখনো?

বন্দনা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, ডাক্তার বললে আলসার হয় নি। তবু সাবধানে থাকতে হবে।

ওকে রোজ রাত্তিরবেলা একটু একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বল!

ওসব কিছু ওর সহ্য হয় না। আপনি তো অনেকদিন আসেন না আমাদের বাড়ি, একদিন আসুন না।

সন্ধ্যের পর আর আমার কোথাও যাওয়া হয় না।

এখন কার সঙ্গে প্রেম চলছে?

বিদ্যুৎ চওড়াভাবে হাসল। তারপর বন্দনার চোখে চোখ চেয়ে বলল, শুধু তোমার সঙ্গেই এখনো কিছু হল না।

বন্দনা শুধু বলল, আহা! শুধু ওই কথাটারই অনেক মানে হয়। কথাটা বলেই বন্দনা বুকের আঁচল ঠিক করল।

বিদ্যুৎ বলল, তোমার তো কোনো কাজ নেই দেখছি। চল, আমার অফিসে চল।

কেন আপনারও কাজ নেই?

আজ আর কিছু করতে ভাল লাগছে না।

বিদ্যুতের অফিসে স্বপ্ন দু-একবার গেছে। পরিতোষকে তার অফিসের কাজেই এদিকে মাঝে মাঝে আসতে হত। তখন কিছুক্ষণের আড্ডা জমত ঘরে। স্ত্রীর অফিসে আসা পরিতোষ পছন্দ করে না। বিদ্যুতের অফিস থেকে টেলিফোনে সেই সময় ডেকে পাঠানো হত বন্দনাকে। তাছাড়া এর পরে একা একাও দু-একবার গেছে বন্দনা। খুব গরমের সময় ওই ঠাণ্ডা ঘরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতে মন্দ লাগে না, বিদ্যুৎ তার ঘরে একলা থাকে, চতুর্দিক বন্ধ ঘর। একদিন বিদ্যুৎ বন্দনার পিঠে হাত দিয়ে তাকে কাছে টানতে চেয়েছিল হঠাৎ।

বন্দনা বলল, না, আজ আর যাব না। আপনার ঘরটা বড় ঠাণ্ডা।

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়াল। বন্দনার শরীরের দিকে শেষবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, বন্দনা, তুমি কখনও কোথাও হেরে গেছ?

তার মানে?

তোমার মুখে সব সময় বেশ একটা ঝলমলে ভাব থাকে। কিন্তু বয়েস হচ্ছে তো, এবার থেকে নানা জায়গায় হারতে শুরু করবে।

বয়েসের খোঁটা দিচ্ছেন! না হয় চল্লিশ পেরিয়েই গেছে—

চল্লিশ হয়ে গেছে নাকি? তা এ রকম চল্লিশ, মন্দ না—

অফিসের দু-একজন লোক এখনো বন্দনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে। বন্দনা সব সময় এড়িয়ে চলে এসব ব্যাপার। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, তার হাসি মুখ কেউ কখনও ম্লান হতে দেখে নি। কিন্তু সে কখনও অফিসের কারুর সঙ্গে একা সিনেমা দেখতে যায় নি; একা কারুর গাড়িতে চাপে নি। ডালহাউসি থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বন্দনা হেঁটেই যায়, তারপর সেখান থেকে লেডিজ ট্রাম ধরে। এতে অফিসের অন্য লোকদের সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা এড়ানো যায়।

মেয়ে বড় হয়ে গেছে, ছেলেকেও পড়াবার জন্যে রোজ সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই আসেন, সুতরাং বন্দনার হুড়োহুড়ি করে বাড়ি না ফিরলেও চলে। কিন্তু বন্দনা একদিনও পরিতোষের পরে বাড়ি ফেরে নি। বাড়ি ফিরে পরিতোষ হাতের কাছেই কাচা গেঞ্জি ও পায়জামা না পেলে ছোট ছেলেদের মতন রাগারাগি করে, তাই বন্দনা ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখে।

অবশ্য বন্দনার একটি গোপন ব্যাপার এখনও আছে। মাসে একবার দু'বার অন্তত সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা না করে পারে না। সঞ্জয়ের সঙ্গে সেই কলেজ জীবন থেকে সম্পর্ক। ওদের বিয়ে করার খুব অসুবিধে ছিল, দুজনের দিক থেকেই। কিন্তু দুজনে দুজনের প্রতি যেন চুম্বকের টানে বাঁধা।

সঞ্জয়ও পরে বিয়ে করেছে, তিনটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু বন্দনা আর সঞ্জয়ের বন্ধুত্ব এখনও ঠিক এক রকমই রয়ে গেছে। ওরা কখনও খুব বেশীদূর এগোয় নি। বিয়ের ঠিক পরের বছরই বন্দনা স্বামীকে লুকিয়ে দুবার সঞ্জয়ের সঙ্গে শুয়েছিল। এখন আর ওসব দিকে একদম যায় না। কদাচিৎ সঞ্জয় তাকে দু-একটা চুমু খায়, কখনও বুকের ওপর মাথা রাখে। আবার এমনও হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যায় দুজনে, কিন্তু পরস্পরকে স্পর্শও করে না।

হঠাৎ অফিস ছুটি হয়ে গেলে কিংবা কোনো কোনোদিন নিজেই অফিস থেকে একটু আগে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে বন্দনা দেখা করে সঞ্জয়ের সঙ্গে। দুপুর রোদ্দুরে গঙ্গার ধারে খুব একটা নির্জন জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে। কিংবা খিদিরপুরের দিকে খুব সাধারণ কোনো চায়ের দোকান, যে খানে বন্দনা বা পরিতোষের চেনাশুনো কেউ কখনও যাবে না। সঞ্জয়কে তার অনেক কিছু বলার থাকে। এমন অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা, যা স্বামীকেও বলা যায় না। কিন্তু সঞ্জয়কে বলা যায়। তাছাড়া সঞ্জয় পারিবারিক জীবনে সুখী নয়, বন্দনার কাছে এসে বসলে সে কিছুক্ষণের জন্য সত্যিকারের আনন্দ পায়। তার চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

মাত্র কয়েকমাস ধরে যেন সঞ্জয়ের সঙ্গেও দেখা করতে ভয় ভয় করে বন্দনার। কোনোদিন হয়তো সঞ্জয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে সে, সঞ্জয় আসতে দেরি করছে। আগে এ রকম হলে সে খুবই রেগে যেত। একলা একলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে। আজকাল একটুক্ষণ দাঁড়াবার পরই বন্দনার মনে হয়, সঞ্জয় বোধহয় কোনো কারণে আটকে পড়েছে, সে আসতে পারবে না। সেজন্যে বন্দনার মন খারাপ হয় না। বরং খানিকটা স্বস্তির সঙ্গে ভাবে, যাক, আজ আর গোপনীয়তার বোঝা বইতে হবে না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে।

নিজেই সে তার এই মনোভাবের জন্যে এক সময় অবাক হয়েছে। সঞ্জয় সম্পর্কে তার আকর্ষণ কি কমে যাচ্ছে? নাকি গোপনীয়তার ভয়টাই বেড়ে উঠছে ক্রমশ? কেন? সে তো কোনো অন্যায় করে নি। বিবাহিতা নারীর কি বন্ধু থাকতে পারে না? কিন্তু কেউ তো এখনও জানতে পারে নি, পরিতোষ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে না—স্ত্রীর কাছ থেকে সে কিছুই এক বিন্দু কম পায় না। বন্দনার নিজের মনের মধ্যেই আলগা হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। এটাই কি বয়েস বাড়ার লক্ষণ?

শহীদ স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বন্দনা। আজ বোধহয় সত্যিই সঞ্জয় আসবে না। তবু আর পাঁচ মিনিট অন্তত দেখা যাক্।

একটা ট্যাক্সি ঘচ করে থামল একটু দূরে। সেটা থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল বিদ্যুৎ—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে!

বন্দনার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে, যদি হঠাৎ এক্ষুনি সঞ্জয় এসে পড়ে? এমন কি দূর থেকেও যদি সঞ্জয় দেখে যে বন্দনা অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে, তাহলেই সে মন খারাপ করে থাকবে। সঞ্জয় দারুণ স্পর্শকাতর। স্বামীর চেয়েও প্রেমিকরা বেশী ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

মুখে হাসি এনে বন্দনা বলল, এমনিই। বাসে যা ভিড়!

চল, আমার সঙ্গে চল।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ডালহৌসির দিকে। কিন্তু তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

না না, তার দরকার নেই। আমি অন্যদিকে যাব।

বিদ্যুৎ একেবারে বন্দনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠভাবে বললে, কেন, আমি পৌঁছে দিলে কোনো দোষ আছে?

বন্দনা জানে, বিদ্যুৎ শুধু পৌঁছে দেবে না, সে আগে কোনো রেস্টুরেন্টে একটু বসে যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করবে। অন্তত ট্যাক্সির মধ্যে বসে হাত ধরার চেষ্টা করবেই। এ ছাড়া বিদ্যুৎ পারে না। বন্দনা দৃঢ় স্বরে বলল, না, আসার দরকার নেই। শুধু শুধু আপনাকে নিয়ে যাব কেন উল্টো দিকে!

বন্দনা হাঁটতে লাগল। সঞ্জয়ের জন্যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

বাড়ির মোড়টায় ট্রাম থেকে বন্দনা দেখল স্বপ্না একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটার চেহারা রোগা পাতলা, মাথা ভর্তি বড় বড় চুল, ধুতি পাঞ্জাবি পরা। আজকাল ছেলেদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখাই যায় না

ছেলেটা হাত পা নেড়ে কথা বলছে খব। একটা শ্যাম্পু কেনার দরকার ছিল, বন্দনা একটা স্টেশনারী দোকানে দাঁড়াল আর আড়চোখে দেখতে লাগল ওদের। সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হল না বলে তার মনটা ভার হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন কেটে গেল সেটা মেয়েকে দেখে।

ছেলেটা স্বপ্নার হাতব্যাগটা নিয়ে টানাটানি করলে। স্বপ্না কিছুতেই দেবে না। ছেলেটা তবু জোর করে নিল, ব্যাগ খুলে কী যেন নিয়ে নিল

বন্দনা ভাবল, চুপি চুপি রাস্তা পার হয়ে যাবে। মেয়ে যেন দেখতে না পায়। স্বপ্না এখন তাকে দেখলে লজ্জা পাবে। তবু রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখল স্বপ্না ও দিকে আসছে। ছেলেটা চলে গেছে।

মাকে দেখতে পেয়ে স্বপ্না কিন্তু চমকাল না কিংবা অবাক হল না। বেশ সপ্রতিভ গলায় বলল, মা তুমি আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? বলেছিলে যে দেরি হবে?

বন্দনা বলল, অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। তুই সেই শাড়িটাই পরেছিস? কী অসভ্য মেয়ে রে তুই!

স্বপ্না হেসে ফেলে বলল, লোভ সামলাতে পারলাম না।

জন্মদিনের দিন একটা পুরোনো শাড়ি পরিস তা হলে!

এইটাই তো এখনো নতুন থাকলে। দু'দিন কি কোনো শাড়ি পুরোনো হয়।

বন্দনার খুব ইচ্ছে করছে ওই ছেলেটা কে সেই কথা জানতে। কী নিল সে স্বপ্নার ব্যাগ থেকে! কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না। মেয়ে যদি ভাবে মা তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে!

রাস্তার এপারে এখনো কতকগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকাল-বিকেল ওরা ঠিক ওই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের কি পায়ে ব্যথাও করে না!

একটা ছেলে শিস দিয়ে উঠল। একজন বিশ্রীভাবে গেয়ে উঠল একটা হিন্দী গানের কলি। বন্দনার মুখটা লাল হয়ে গেল। মেয়ে কী ভাবছে! ছি ছি ছি। এ পাড়ার ছেলেগুলো এত অসভ্য! বন্দনাকে দেখলে দু'বেলাই এ রকম জ্বালাতন করবে। বন্দনা আঁচলটাকে সারা গায়ে চাপা দিল।

এ পাড়ায় মাত্র কয়েক মাস আগে তারা বাড়ি বদল করে এসেছে। এখনো তাদের অনেকেই চেনে না। আগের পাড়ার ছেলেগুলো কক্ষনো এ রকম করত না বরং বৌদি বলে খুব খাতির করত।

স্বপ্না বলল, এ পাড়াটা একদম ভাল না। আগের পাড়াটা অনেক ভাল ছিল।

বন্দনা বলল, এখানকার বাড়িটা তো ভাল। আগের বাড়ির বাথরুমটা যে এত খারাপ ছিল।

তা হোক, এ পাড়ার ছেলেগুলো বড্ড অসভ্য।

বন্দনা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল। এইটুকু মেয়ে, এর মধ্যেই এসব চিন্তা তার মাথায় ঢুকল কেন?

পরক্ষণেই বন্দনার সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। স্বপ্না তো আর তেমন ছোট নেই। ওর মতন বয়সেই তো বন্দনার সঙ্গে সঞ্জয়ের ভাব হয়েছিল। একটু আগে ছেলেগুলো যে অসভ্য আওয়াজ করে উঠল, সে কি তাহলে স্বপ্নাকে দেখেই! বন্দনা ভেবেছিল···। বন্দনা আর স্বপ্না পাশাপাশি হাঁটলে কিছুতেই মনে হয় না মা আর মেয়ে। মনে হয় দুই বোন। কাল থেকে অফিস যাবার সময় বন্দনা আর হাত-কাটা ব্লাউজ পরবে না।

স্বপ্নার জন্মদিনে বিশেষ কারুকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। স্বপ্নার পাঁচটি বান্ধবী এসেছিল শুধু। পরিতোষ মেয়ের জন্যে আর একটি নতুন শাড়ি কিনে এনেছে। মেয়ে বাবার বড্ড আদুরে। আগের কেনা শাড়িটা স্বপ্না আগেই পরে ফেলেছে বলে সে বলেছিল, কী দুষ্টু মেয়ে দেখেছ! দুটো শাড়ি আদায় করার মতলব।

বন্দনা বলল, তুমি কিনতে গেলে কেন আর একটা?

পরিতোষ বলল, ছাখ না, সামনের বছর ঠিক জন্মদিনের সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে শাড়ি কিনে আনব। তার আগে কিছুতেই আনছি না!

বন্দনা হেসে তবু বলেছিল, আমার জন্মদিনে তো তুমি শাড়ি কিনতেই ভুলে গিয়েছিলে! আর মেয়ের বেলা দু' দুটো!

তোমার কথা আর মেয়ের কথা কি এক হল! ও ছেলেমানুষ, নতুন শাড়ি পরতে শিখেছে, ওর তো শখ বেশী হবেই!

স্বপ্নার বান্ধবীরা চলে গেছে, এবার ওরা নিজেরা খেতে বসবে, এমন সময় বিদ্যুৎ এসে হাজির। যদিও মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, তবু একটা জ্বলজ্বলে হলুদ রঙের শার্ট পরেছে বলে তাকে দেখাচ্ছে খুব সুন্দর।

সে ঢুকেই বলল, পরিতোষ, তোর নাকি শরীরটা খারাপ!

বন্ধুকে দেখে খুশি হয়ে উঠল পরিতোষ! বলল, এসেছিস? তোর তো আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায় না। বোস্!

বিদ্যুৎ বন্দনার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, বন্দনার কাছ থেকে তোর খবর পাই মাঝে মাঝে।

বন্দনা বলল, বসুন। এই স্বপ্না তোর বিদ্যুৎ কাকাকে প্রণাম কর।

বিদ্যুৎ চমকে উঠে বলল, আরে এ মেয়েটা কে? এই স্বপ্না নাকি! কবে এত বড় হয়ে গেল? এ তো দেখছি একেবারে পুরোপুরি একটি লেডি।

স্বপ্না প্রণাম করার জন্যে নিচু হতেই বিদ্যুৎ তার হাত ধরে ফেলে বলল। কেন, প্রণাম করার ঘটা কেন? কি হয়েছে? ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

বন্দনা বললে, আজ ওর জন্মদিন।

পরিতোষ বলল, আজ ও আঠারো বছরে পা দিল।

বিদ্যুৎ বলল, তাই নাকি? তার মানে তোর মেয়ে আজ অ্যাডাল্ট? ইস্, আমার তো কিছু একটা জিনিস নিয়ে আসা উচিত ছিল, জানতাম না।

বন্দনা বলল, আমরা কারুকেই বলি নি। এমন নিজেদের মধ্যে—

বিদ্যুৎ স্বপ্নার দিকে চেয়ে বলল, ঠিক আছে স্বপ্না, এই উপলক্ষে তোমাকে একদিন আমি ট্রিট করব। তুমি আমার সঙ্গে সিনেমা দেখবে, বাইরে খাবে।

বন্দনা বলল, স্বপ্না, যা তোর কাকাবাবুর জন্যে একটু মিষ্টি নিয়ে-আয়।

আমি মিষ্টি-ফিষ্টি খাই না।

একটু পায়েস তো খাবেন!

পায়েস হয়েছে বুঝি! তা খেতে পারি, অনেক দিন খাই-নি। ঠাকুর-চাকররা তো পায়েস রান্না করে দেয় না—

পরিতোষ বললে, তুই আর বিয়ে-থা করলিই না তা হলে।

চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে বিদ্যুৎ বলল, বেশ আছি ভাই। যাক গে, তোর কী হয়েছে বল্‌তো? এত ভুগছিস কেন?

পরিতোষ অসুখের গল্প করতে ভালবাসে। তার পেটের গণ্ডগোলের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে বলল, এ বছরটা এই রকম ভুগতেই হবে, চিকিৎসা করেও লাভ নেই।

কেন ভুগতেই হবে কেন?

কাল একজন খুব ভাল জ্যোতিষীকে আমার কুষ্ঠিটা দেখিয়েছিলাম। শনি এখন বক্রি হয়েছে। বৃহস্পতির ওপর যদি শনি এসে পড়ে—

বিদ্যুৎ হা-হা করে উঁচু গলায় এসে উঠল।

বন্দনা বলল, আপনি বুঝি এসব বিশ্বাস করেন না?

বিদ্যুৎ বন্দনার কথায় উত্তর না দিয়ে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে বলল, তুইও শেষে ঠিবুজী কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করতে শুরু করলি! এই সব হচ্ছে হেরে যাবার লক্ষণ। বয়েস বাড়লে এ রকম হয়।

পরিতোষ দুর্বলভাবে বলল, আমি ঠিক যে বিশ্বাস করি তা নয়, তবে অনেক সময় এগুলো এমন মিলে যায়।

ওইটাই তো হেরে যাওয়ার লক্ষণ। আজ থেকে অনেক দিন আগে ভোনসের একজন ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন, পেটের ব্যথা-ট্যথা ঠিক পেটের অসুখ নয় মাথার অসুখ। তোর অফিসের গোলমালটা মিটেছে?

কিছুতেই প্রমোশনটা দিল না।

আসলে তো তুই প্রমোশনের ব্যাপারটা জানবার জন্যেই জ্যোতিষের কাছে গিয়েছিলি! মানসিক বার্ধক্যের খাঁটি লক্ষণ।

স্বপ্না পায়েসের থালা এনে বিদ্যুতের পাশে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, সত্যি বাপী, তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে যাচ্ছ আজকাল!

বিদ্যুৎ স্বপ্নার কাঁধে হাত রেখে বললে, এই ছাখ ইয়ংগার জেনারেশন—ওসব কিছু বিশ্বাস করে না। ওরা অনেক ফ্রী। বন্দনাকে বলেছিলাম রোজ তোকে একটু করে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াতে—তাহলে টেনশান অনেক কেটে যেত।

মেয়ের সামনে নিষিদ্ধ পানীয় উল্লেখ করাতে বন্দনা আর পরিতোষ দুজনই অস্বস্তি বোধ করে। দুজনেই মেয়ের দিকে তাকায়।

স্বপ্না বলল, বাপী তাই খাও না! ব্র্যাণ্ডি তো ডাক্তাররাও খেতে বলে।

চমৎকার মেয়ে! এই কথা বলে বিদ্যুৎ স্বপ্নার কাঁধ ধরে নিজের দিকে একটু টানল। স্বপ্নার পিঠটা ছুঁয়ে রইল বিদ্যুতের বুকে।

বন্দনা সেদিকে আড়চোখে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

অফিসের বন্ধ ঘরে বিদ্যুৎ তাকেও ওই রকমভাবে টানতে চেয়েছিল।

তাড়াতাড়ি সে বললে, এই স্বপ্না, পায়েস দিলি, জল দিলি না! যা জল নিয়ে আয়।

স্বপ্না আদুরে গলায় বলল, মা, তুমি একটু এনে দাও!

পরিতোষও প্রশ্রয় দিয়ে বলল, জন্মদিনে তুমি মেয়েটাকে বড্ড খাটাচ্ছ!

বন্দনার হঠাৎ অভিমান হয়ে গেল। সে বুঝি মেয়েকে কম ভালবাসে।

পরিতোষ কিছু বোঝে না। সে গজগজ করে বলল, এ সব শিখতে হয়। মিষ্টি দিলে যে সঙ্গে জলও দিতে হয়—

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি তুমি কতটা লম্বা হয়েছ?

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উচ্চতা মাপবার কথা, কিন্তু বিদ্যুৎ স্বপ্নাকে নিয়ে এল নিজের বুকের কাছে। বলল, ইস, প্রায় আমার চিবুকের সমান, বেশ লম্বা হয়েছ কিন্তু। সেইদিনও যাকে ফ্রক পরা পুঁচকে মেয়ে দেখেছি আজ সে পুরোপুরি ইয়ং লেডি। পরিতোষ বলল, বিদ্যুৎ, তোর যে বয়েস বেড়েছে সেটা কিন্তু বোঝাই যায় না।

বন্দনার কিন্তু পছন্দ হল না এ কথাটা। সে বলল, কেন বোঝা যাবে না, বেশ তো চুল পেকেছে।

চুল পাকলে আর কি হয়। বিদ্যুৎ আমার চেয়ে এক বছরের বড়।

একটু বাদে বিদ্যুৎ স্বপ্নাকে বলল, তাহলে এই কথা রইল, একদিন আমার সঙ্গে সিনেমা বাইরে খাওয়া—তোমার জন্মদিন উপলক্ষে তোমার বাবা মাকে নেমন্তন্ন করতে পারি। না-ও পারি।

রাত্তিরবেলা বিছানায় পরিতোষের পাশে শুয়ে বন্দনা বলল, তোমার বন্ধু ওই বিদ্যুৎকে আমার একটুও ভাল লাগে না!

পরিতোষ রীতিমত অবাক হয়ে গেল। কেন, হঠাৎ বিদ্যুৎ কি করল? আগে তো তুমি ওর সঙ্গে খুব গল্প করতে।

আজকাল যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে! একটু হালকা ধরনের।

ও একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে ভালবাসে। কিন্তু যাই বল, খাঁটি জেন্টলম্যান।

ছাই জেন্টলম্যান! এক একদিন এক একটা মেয়ের সঙ্গে—

তুমি আবার তা দেখলে কী করে?

সবাই তো বলাবলি করে।

এক সময় ওর খুব মেয়েদের সঙ্গে ঝোঁক ছিল বটে। কিন্তু তখনও আমরা জেনেছি ও খাঁটি জেন্টলম্যানের মতন কখনো কোনো মেয়ের ওপর জোর করে নি। কারুকে মিথ্যে কথা বলে ভোলায় নি, অনিচ্ছুক মেয়ের সঙ্গে ও কিছু করে নি।

তুমি দেখছি তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে একেবারে গদ্‌গদ।

রাগ করে চুপ করে রইল বন্দনা। পরিতোষ কিছু বোঝে না। বাচ্চা

মেয়েদের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু আছে নাকি? তাদের তো কেউ একবার একটু সুন্দব বললে অমনি গলে যায়।

আদর করাব জন্যে পবিতোষ যখন বন্দনাব জামার বোতাম খুলতে লাগলেন তখন বন্দনার মনে পড়ল। কতদিন সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। পবক্ষণেই এজন্য অনুতপ্ত বোধ কবল সে। পাশ ফিবে স্বামীকে আবেগেব সঙ্গে জড়িয়ে ধবল।

দিন তিনেক বাদে কলেজ থেকে ফিবে স্বপ্না উত্তেজিতভাবে বলল, মা, আজ বিদ্যুৎকাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বন্দনা সতর্কভাবে বলল, কোথায়? কী কবে দেখা হল?

আমবা কলেজ থেকে ডিবেট শুনতে এসেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি কি, ও মা, বিদ্যুৎকাকা একজন জজ। উনি নাকি একসময় ভাল ডিবেটাব ছিলেন। আচ্ছা মা, বিদ্যুৎকাকা খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, তাই না?

তা আমি কি কবে জানব? তোব বাবাকে জিজ্ঞেস কবিস।

বিদ্যুৎকাকা গাড়িতে কবে আমাকে পৌঁছে দিলেন আব পার্ক স্ট্রীটে চাইনীজ খাবার খাওয়ালেন।

বন্দনা ঠিক বুঝেছিল। বিদ্যুৎ শুধু পৌঁছে দেয় না কাকুকে, মাঝপথে কোন দোকানেও নিয়ে যায়। ও কি স্বপ্নাবও হাত ধবেছিল? বন্দনা ভাববার চেষ্টা কবল, সেই দোকানে কেবিন আছে কিনা। নেই বোধহয়। যাক তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু গাড়িতে—।

তুই একা ছিলি?

আমাদের ক্লাসেব আবও দুটি মেয়ে ছিল।

বন্দনা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলল। শুধু শুধু বিদ্যুৎকে সে খাবাপ ভাবছিল। হাজার হোক মানুষটা দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। একটু আমুদে স্বভাবেব এই যা।

মা, বিদ্যুৎকাকাব কিন্তু দারুণ ম্যানলি চেহাবা।

হুঁ।

কী সুন্দর কবে কথা বলতে পাবেন। অনেক কিছু জানেন। আমাদের বলছিলেন চার্লস লিণ্ডবার্গের কথা। যিনি প্রথম এরোপ্লেনে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। পরে যখন এরোপ্লেনকে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়, জানো মা, ওই লিণ্ডবার্গ ই তখন তার বিরুদ্ধে প্রচাব শুরু করেন।

আচ্ছা আচ্ছা, যা এখন জামা-কাপড় ছেড়ে নে।

বিদ্যুৎকাকাকে আমি বলেছি, খাওয়াটা তো হল, এখনও কিন্তু সিনেমা দেখানোটা বাকি রইল—

আবার সিনেমায় যাবি ?

বাঃ, উনিই তো বলেছিলেন সেদিন। তোমার মনে নেই।

সে তো এমনি কথার কথা।

মোটেই কথার কথা নয়। আমি ছাড়ছি না। বিদ্যুৎকাকা ভুলে গেলেও আমি ঠিক মনে করিয়ে দেব !

বন্দনা একবার ভাবল মেয়েকে ধমক দিয়ে বলে দেবে, না, বিদ্যুৎকাকার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পাবি না ! কিন্তু থেমে গেল। মেয়ে যদি কারণ জিজ্ঞেস করে ? সরল মেয়ে, কিছুই বোঝে না। সে কি মেয়ের সামনে বিদ্যুতের নিন্দে করতে পারবে। মেয়ে যদি মুখের ওপর বলে দেয়, ছিঃ মা, তোমার মনটা এত নোংরা ! কথা ঘুরিয়ে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বন্দনা বলল, তোদের ক্লাসের কোনো ছেলে-টেলের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হয় নি ?

হ্যাঁ, কেন হবে না।

কেউ প্রেম-ট্রেম করার চেষ্টা করে না। আমাদের সময় ক্লাসের ছেলেরা তো খুব জ্বালাতন করত।

স্বপ্না অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বলল, যা সব ন্যাকা ছেলে, ওদের সঙ্গে প্রেম করতে বয়ে গেছে ! একটুও ম্যাচিওরিটি নেই।

বন্দনার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, সেদিন ট্রাম স্টপে সেই ছেলেটি স্বপ্নার ব্যাগ থেকে কী বার করে নিয়েছিল ? কিন্তু জিজ্ঞেস করা হল না।

পরিতোষ ক'দিন থেকে অসুস্থ। ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। তার অসুস্থতা এমনিতে বোঝা যায় না, বাড়িতে বিশ্রাম নিলে সে বেশ ভালই থাকে। মেজাজটাও ভাল থাকে।

বেস্পতিবার সন্ধের পরেও স্বপ্না বাড়ি ফিরল না। বন্দনা আর পরিতোষ দুজনেই দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। মেয়ে তো কক্ষনো এত দেরি করে না। যদি সে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কোথাও যায়, খবর দেয় আগে।

স্বপ্না ফিরল ন'টার একটু পরে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, হঠাৎ বিদ্যুৎকাকার সঙ্গে সিনেমা চলে গেলাম।

পরিতোষ খানিকটা নিশ্চিন্তভাবে বলল, বিদ্যুতের সঙ্গে! সেই যে সেদিন বলেছিল, তুই বুঝি ঠিক আদায় করেছিস?

বন্দনা গম্ভীর। একটু কড়াভাবে বলল, বাড়িতে কোনো খবর দিস নি কেন!

বাঃ। সেদিন তোমাকে বললাম না! কাকার সঙ্গে সিনেমায় যাব—

তা বলেছিলি। কিন্তু আজকেই যে যাবি—

ঠিক ছিল না তো কিছু। বিদ্যুৎকাকাকে টেলিফোন করলাম, অমনি উনি বললেন, চল। তাহলে আজকেই চল—

পরিতোষ জিজ্ঞেস করল, বাড়ি ফিরলি কার সঙ্গে?

বিদ্যুৎকাকাই পৌঁছে দিয়ে গেল।

ওকে টেনে নিয়ে এলি না কেন?

উনি বললেন, আর একদিন আসবেন। আজ একটা পার্টি আছে। বাবা, আমি একদিন বিদ্যুৎকাকার বাড়িতে যাব। ওঁর বাড়িতে নাকি অনেক বই আছে।

তা আছে। ও তো একটা বইয়ের পোকা।

বন্দনা জিজ্ঞেস করল, তুই একা গিয়েছিলি? না আর কেউ ছিল?

আর কে থাকবে?

একা সিনেমায়, তারপর গাড়িতে। স্বপ্নার চোখ মুখ কি বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে? একটু বেশী ছটফটে? বন্দনার বুক কাঁপে।

দু'দিন ধরে বন্দনার মনটা ভার হয়ে থাকে। কিছুতেই মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা মন থেকে তাড়াতে পারে না। মেয়েকে ঠিক শাসনও করতে পারে না। মনে পড়ে নিজের ওই বয়েসটার কথা। মা-বাবা তখন কোনো ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেই গা জ্বালা করত। বাড়িতে কড়া শাসন ছিল বলেই তো সে লুকিয়ে লুকিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে—। তবু তো স্বপ্না এখনো কিছু লুকোয় না।

সমবয়সী ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করবেই। সময় অনেক বদলে গেছে। বেশী শাসন করতে গেলে আরও গোলমাল হয়। কিন্তু স্বপ্না যদি বিদ্যুতের বেশী ভক্ত হয়ে পড়ে—একটা বাচ্চা মেয়ে, ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা নেই।

এ কথা বন্দনা কার সঙ্গে আলোচনা করবে? স্বামীকে বললে সে হেসে উড়িয়ে দেবে! বিদ্যুৎ সম্পর্কে তার অন্ধবিশ্বাস। মেয়ে যে বড় হয়েছে পরিতোষ তাও বোঝে না। এই বিষয় নিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গেও আলোচনা করা যায় না। সঞ্জয়ের কাছে সে একটি নারী। সেখানে তো সে জননী নয়।

স্বপ্না বিদ্যুতের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে পরিতোষকে রোজ তাড়া দিচ্ছে। পরিতোষের সময় হচ্ছে না। স্বপ্না তাহলে একাই যেতে চায়। বন্দনা নানা ছুতোয় তাকে নিরস্ত করছে প্রত্যেক দিনই। মেয়ের যেন আরও বয়েস কমে যাচ্ছে দিন দিন। একটা কিছু হুজুগ উঠলেই হল। কোথায় ছিল বিদ্যুৎ মাত্র দু' সপ্তাহ আগেও? এই বাড়িতে সে আগে কখনো আসেই নি। পুরোনো বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত, ছেলেমেয়েদের অনেক মজার মজার গল্প বলত। তখন তার চোখ ছিল বন্দনার দিকে। তখন ভয় ছিল না।

অফিসে বেলা তিনটের সময় টেলিফোন করল সঞ্জয় চাপা, মৃদু গলা। আজ কি বন্দনা দেখা করতে পারবে তার সঙ্গে?

বন্দনা রীতিমত কেঁপে উঠল। প্রায় দু' মাস দেখা হয় নি সঞ্জয়ের সঙ্গে। আজকের দিনটা মেঘলা মেঘলা। ঢুক করে অনায়াসেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়া যায়। বন্দনা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন আছ।

সঞ্জয় বলল, কি জানি!

সঞ্জয় এইভাবেই কথা বলে। যখনই তার মন খারাপ থাকে সে স্পষ্ট করে কোনো কথা বলতে চায় না। শিশুর মতন অভিমান করে থাকে। অনেক আদর যত্নে বন্দনাকে ওর মান ভাঙাতে হয়।

তুমি আজ আসতে পারবে?

বন্দনা একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, আজ যে কোনোক্রমেই উপায় নেই।

কেন?

আজ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরব বলে এসেছি। ও বাড়িতেই থাকে কিনা।

আচ্ছা—

এই, শোন—

সঞ্জয় লাইন কেটে দিয়েছে। এর পরে কোন্ দিন দেখা হতে পারে, সে কথাও জিজ্ঞেস করল না। পুরুষমানুষ এত অভিমানী হয়!

বন্দনার মনের মধ্যে একটা বিষাদ, অথচ শরীরে যেন একটা উত্তেজনার ভাব। কেন সে সঞ্জয়কে 'না' বলল? সত্যি তো বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই দু'মাস বাদে যদি সে সঞ্জয়ের পাশে আজ কিছুক্ষণ বসতে পারত, সে নিজেই হয়তো একটু শান্তি পেত।

শরীরের চাঞ্চল্যটা কিন্তু রয়েই গেল। কিছুতেই মন বসছে না। এক সময় সে তার অফিস থেকে বেরিয়ে চলে এল পাশেব অফিসে।

বিদ্যুৎ খুব মন দিয়ে কি যেন লিখছিল। বন্দনা ঘরে ঢোকার পর স্প্রিং দরজা আপনা আপনি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ তুলে তাকাল। বেশ খুশি হল বন্দনাকে দেখে।—হঠাৎ তুমি চলে এলে যে?

এমনিই। কেন, আসতে পাবি না?

অনেকদিন আস নি তো।

আপনিও তো যান নি।

ভাবলাম, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমাব সঙ্গে কি আর তোমাব কথা বলতে ভাল লাগবে? বস, দাঁড়িয়ে বইলে কেন?

বসতে গিয়েও বসল না বন্দনা। বিদ্যুতেব ফাইলের দিকে চোখ গেল। বিদ্যুৎ কিছু লিখছিল না, পেন্সিলে হিজিবিজি ছবি আঁকছিল। একটি মেয়ের মুখ।

ছবিটা ভাল করে দেখাব জন্যে বন্দনা ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। না, চেনা কারো মুখেব আদল নেই। এই বুঝি কাজ হচ্ছে?

কি কবি, কাজে মন বসছে না।

সেদিন পাকা চুল বলেছিলাম বলে বুঝি বাগ কবা হয়েছিল? হাত দিয়ে দুষ্টুমীর ভঙ্গিতে বিদ্যুতের মাথাব সব চুল এলোমেলো কবে দিল বন্দনা।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল।

সোজা সেই চোখে চোখ ফেলে হাসি ঝলমলে তাকিয়ে বইল বন্দনা। এখন যদি বিদ্যুৎ তার কাঁধ ধবে বুকেব কাছে টেনে নিয়ে আসতে চায়, সে আপত্তি করবে না। বিদ্যুৎকে ফেরাতেই হবে।

বিদ্যুৎ নাকি জেন্টলম্যান। সেইটুকুই যা ভবসা।

রাজহংসী

কী একটা দরকারী কাজে যাচ্ছিলাম আগরতলায়। প্লেন দু' ঘণ্টা লেট! অত্যন্ত বিরক্তিকর সেই দু' ঘণ্টা দমদম বিমান বন্দরে অপেক্ষা করে কাটলো। কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে আসবার পথে বেলেঘাটায় দারুণ ট্রাফিক জ্যাম ছিল, তখন ভেবেছিলাম প্লেন বুঝি আমাকে বাদ দিয়েই উড়ে চলে যাবে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌঁছোবার পর এই অকারণ অপেক্ষা।

আকাশে মেঘ জমেছে। এই মেঘ কতখানি জমাট আর এর মধ্যে ঝড়বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা আছে কিনা আমি জানি না। যদি প্লেন আজ না যায়? আসাম-ত্রিপুরা ফ্লাইট প্রায়ই ক্যানসেল্‌ড হয়! আগরতলা বিমান বন্দরে আমার জন্য লোকজন অপেক্ষা করে থাকবে! দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে। একটা চেনাশুনো লোকও চোখে পড়ছে না। তা হলে অন্তত কথা বলে সময় কাটানো যেত। এয়ার হোস্টেস আর বিমানকর্মীরা ঘোরাঘুরি করছে ব্যস্তভাবে। ওদের সব সময়েই ব্যস্ত মনে হয়। ওদের দেখলেই অন্য যাত্রীদের চোখ উৎসুক হবে, হয়তো কোনো খবর শোনা যাবে। কিন্তু কেউ কিছুই বলছে না। আমি একটা বই খুলে বসেছিলাম, কিন্তু মন বসছে না কিছুতেই।

তারপর এক সময় আমাদের বিমানের নাম-ঘোষণা হলো। গনগনে রোদের মধ্যে অনেকখানি সিমেন্টের মাঠ পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে লাইন দিলাম। আমার এক হাতে একখানা মোটা বই, অন্য হাতে একটা ব্যাগ। অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম।

সিঁড়ির একেবারে ওপরে একজন এয়ার হোস্টেস দাঁড়িয়ে থাকে, যার কাজ মিষ্টি হেসে প্রত্যেক যাত্রীকে নমস্কার করা। প্রত্যেক দিন প্রতিটি প্লেন ছাড়ার সময় এই কাজটা করতে হয় বলে তাদের হাসিটা নিতান্তই যান্ত্রিক। একটুখানি হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে যায়।

সাধারণত সুশ্রী মেয়েদেরই এয়ার হোস্টেস করা হয়। তারাও আবার বেশী সাজগোজ করে আরও খানিকটা কৃত্রিম-সুন্দরী হয়ে থাকে। ওদের সবাইকেই প্রায় একই ধরনের দেখায় বলে আমি দু'এক পলকের বেশী দেখি না।

সিঁড়ির ওপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল সে আমাকে 'নমস্কার' বলতেই আমি মাথা ঝুঁকিয়ে 'নমস্কার' বলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলাম। এই সময় আবার যেন শুনলাম সে বলছে, 'নমস্কার সুনালদা!'

ভুল শুনলাম! ফিরে তাকালাম আবার।

মেয়েটি হাসছে। এয়ার হোস্টেসের যান্ত্রিক হাসি নয়, একটি যুবতী মেয়ের চেনা-হাসি!

আমি বললাম, 'খুকু!'

ততক্ষণে পেছনের লোক এসে গেছে। প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটার বেশী দুটি কথা বলার রেওয়াজ নেই। বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে আমাকে ভেতরে চলে যেতেই হলো।

নিজের জায়গাটা খুঁজে পেতে বেশী দেরি হলো না। যাক, জানলার ধারেই জায়গা পাওয়া গেছে। ব্যাগটা ওপরের তাকে তুলে দিয়ে আরাম করে বসলাম। সীট বেল্টটা বেঁধে নিতে হলো। এখন সিগারেট ধরাবার নিয়ম নেই।

আমার বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। সত্যিই কি খুকুকে দেখেছি? ভুল করি নি তো? কিন্তু ঠিক সেই রকমই তো সরলতা আর দুষ্টুমী মেশানো হাসি।

আমার পাশের সীটে এসে বসলো একজন বিশাল চেহারার অবাঙালী ভদ্রলোক। কোনো ভারী জিনিসের ব্যবসায়ী মনে হয়।

আজ প্লেনটাতে যাত্রী বেশী নেই। কয়েকটি সীট পুরো খালি পড়ে আছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, প্লেনটা দৌড় দেবার আগে দম নিচ্ছে।

দু'জন এয়ার হোস্টেস ঘোরাঘুরি করছে। আমি চোখ দিয়ে ওদের একজনকে অনুসরণ করতে লাগলাম। না, মেয়েটি যে খুকুই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কোনো চেনা মেয়ের পক্ষে এয়ার হোস্টেস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়! বস্তুত আমি আরও দু'জন এয়ার হোস্টেসকে চিনি। কিন্তু খুকুকেই যে এখানে এ অবস্থায় দেখবো, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা যেন অতি নাটকীয়, বড় বেশী গল্পের মতন—ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

এখন বুঝতে পারলাম, লাউঞ্জে অপেক্ষা করার সময়, আমি খুকুকে দু একবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তখন কিছুই মনে হয় নি। এয়ার হোস্টেসদের সাজগোজ আর চাকচিক্যই বেশী চোখে পড়ে। তখন যদি চিনতে পারতাম, তা হলে খুকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারতাম। বুকের মধ্যে দারুণ কৌতূহল

ছটফট করছে। যেন একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী অর্ধেকটা পড়ার পর বইখানা হারিয়ে গিয়েছিল, আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে হাতে। কিন্তু খুকু কি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে? বিমানের মধ্যে কি কোনো যাত্রীর সঙ্গে ওদের গল্প করার নিয়ম আছে?

প্লেন আকাশে উড়তেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ যে বাড়ি-ঘর মানুষ-জন একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে, এই দৃশ্যটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। এই জন্যই জানলার পাশে জায়গা না পেলে রাগ ধরে।

সীট বেল্ট খোলার অনুমতি পেয়ে সিগারেট ধরালাম। খুকু আরও দু'এক-বার চলে গেল আমার কাছ দিয়ে, আমার দিকে আর তাকাচ্ছেই না। এখন কাজের সময়—এখন তো আর ওদের গল্প করার কথা নয়।

এয়ার হোস্টেস দু'জনই লজেন্সের ট্রে নিয়ে বিলি করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার খুকু আমাকে দিতে এল না, এল অন্য মেয়েটি। খুকু কি এখন ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? তা হলে হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাকলো কেন! ও যদি আমার নাম না বলতো, তা হলে হয়তো আমি ওকে চিনতামই না। বড় জোর আমি মনে করতাম, খুকুর সঙ্গে মেয়েটির চেহারার মিল আছে।

এবার ওরা চা কফি দিচ্ছে। খুকু জানে, আমি চা খেতে কত ভালোবাসি! ছাত্র বয়সে সারা দিনে অন্তত দশ-বারো কাপ চা খেতাম। এখনো সে নেশা যায় নি। খুকুর কি মনে আছে সে কথা? অনেক সময় খুকুই আমার জন্য চা বানিয়ে আনতো তিনতলা থেকে। আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির যে কোনো ফ্ল্যাটে চা হলেই সে জানে আমার জন্যও এক কাপ বেশী জল নেওয়া হতো। একদিন দুপুর দুটোর সময় এক কাপ চা এনে খুকু বলেছিল, 'ভাগ্যিস একতলার ফ্ল্যাটে গেস্ট এসেছে, তাই তুমি এখন চা পেলে সুনীলদা।' খুকুর কি মনে আছে? এবারেও অন্য মেয়েটিই আমাকে জিজ্ঞেস করতে এল, আমি চা না কফি খাবো। আমার পাশের লোকটি চা চাইলেন বলেই আমি ইচ্ছে করেই বললাম, কফি।

পাশের লোকটি চা পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমার কফি আর আসেই না। আমার আসনটা প্লেনের প্রায় লেজের দিকে। সেই জন্যই বোধহয় আসতে দেরি হচ্ছে।

পাশের লোকটি একবার উঠে গেলেন। বোধহয় বাথরুম। একটু বাদে

পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই লোকটির সঙ্গে খুকু কথা বলছে। খুকু কি এই লোকটিকে চেনে নাকি! কি ব্যাপার রে বাবা।

আমি আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। এখন আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু মেঘের খেলা। মেঘ বলেও ঠিক চেনা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাদা বরফের দেশ। তার ওপর এসে পড়েছে শেষ সূর্যের আলো।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বললো, 'এই নিন, আপনার কফি নিন।'

দেখলাম দুটো কাগজের গেলাসে কফি নিয়ে খুকু দাঁড়িয়ে আছে। কফির গন্ধের চেয়েও বেশী পাচ্ছি তার গায়ের মিষ্টি সেন্টের গন্ধ।

মুচকি হেসে খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বুঝি আজকাল কফি খেতে ভালোবাসেন? চায়ের নেশা চলে গেছে?'

তা হলে মনে আছে খুকুর। একটু আনন্দ হলো। খুবই সামান্য ব্যাপার —তবু কেউ আমার পুরনো দিনের কোনো কথা মনে রেখেছে, এটা জানলেই এ রকম আনন্দ হয়। কারণ আমি তো অন্য কারুরই পুরনো দিনের কথা ভুলি না। আমার দুঃখই এই, আমি কিছুই ভুলি না। এমন অনেক কিছুই থাকে যা ভুলে যাওয়াই ভালো। খুকুর পুরনো দিনের কথা যদি ভুলতে পারতাম, তা হলে ওর সঙ্গে কথা অনেক সহজ হতো।

আমার হাতে একটি গেলাস দিয়ে খুকু বললো, 'সুনীলদা, আপনার পাশে বসবো?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বসে পড়লো ঝপাৎ করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে যে ভদ্রলোক ছিলেন—'

দুষ্টু হেসে খুকু উত্তর দিল, 'তাকে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি জানলার ধারে।'

আমি কফিতে চুমুক দিলাম। পরের কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে যান নি!'

—'একটু নয়, খুব!'

—'আগরতলা কেন যাচ্ছেন?'

—'একটা কাজে।'

—'ক'দিন থাকবেন?'

—'চার পাঁচদিন।'

—'আমিও থাকবো, এক সপ্তাহ।'

—'তোমাদের পরের ফ্লাইটেই ফিরে আসতে হয় না?'

—'আমি ছুটি নিয়েছি।'

—'খুকু, তুমি কতদিন এই চাকরিতে ঢুকেছো?'

খুকু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, 'চুপ, আমাকে খুকু খুকু বলবেন না। আমার নাম বাসবী চৌধুরী।'

—'এরকম সিনেমা অ্যাকট্রেসের মতন নাম আবার তোমার কবে থেকে হলো?'

—'সত্যিই আমার ভালো নাম বাসবী। অনেকে অবশ্য আমাকে জয়শ্রী বলেও ডাকতো।'

আমি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলাম। ওর জয়শ্রী নামটা আমি আগে শুনেছি। অবনীও ওকে ডাকতো ওই নামেই। আমরা অবশ্য খুকুই বলতাম।

যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ও ফ্রক পরতো, ক্লাস নাইনের ছাত্রী। থাকতো আমাদেরই পাড়ায়। বয়েসের তুলনায় চেহারাটা বেশ বড়, তখন থেকেই পাড়ার ছেলেদের নজরে পড়ে গেছে।

অত্যন্ত একটা টাইট ফ্রক, কাঁধের কাছটা ছেঁড়া—সেই ছেড়া জায়গাটা ডান হাতে চেপে ধরে খুকু আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে—এই দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসে।

খুকুরা থাকতো অন্য বাড়িতে। ওদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। আমাদের বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে অনেক লোকজন। এরই একটা ফ্ল্যাটে এক সময় খুকুর এক দূর সম্পর্কের কাকা থাকতেন। সেই সূত্রে খুকু আসতো। তারপর খুকুর কাকারা উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ততদিনে প্রতিটি ফ্ল্যাটের লোক-জনের সঙ্গে খুকুর চেনা হয়ে গেছে—এবং সকলের সঙ্গে সে দাদা-কাকা, মাসী-পিসীর সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। সব ঘরের দরজাই তার জন্য অবারিত।

পাশ ফিরে খুকুর দিকে ভালো করে তাকালাম। সেই খুকু এখন বাসবী চৌধুরী। ফিটফাট সেজেগুজে আছে। ঝরঝর করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। মাত্র ছ' সাত বছরের ব্যবধান। এর মধ্যেই কত রকম কাণ্ড ঘটে গেছে এই মেয়েটিকে নিয়ে।

খুকু বললো, 'এক বছর দু' মাস হলো এই চাকরিতে ঢুকেছি—এবার ছেড়ে দেবো বোধহয়।'

—'সে কি ? কেন ?'

—'আর ভাল্লাগছে না। এর মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে গেছে।'

—'এরপর কি করবে ?'

—'কি জানি !'

বলেই খুকু আবার সরলভাবে বসলো। এটাই খুকুর খাঁটি স্বভাব। পরের দিন যে ও কি করবে, তা ও নিজেই জানে না !

খুকু ছিল যাকে বলে পাড়া বেড়ানি মেয়ে। সব সময় এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াতো। আমাদের বাড়ির কেউ খুকুকে বিশেষ পছন্দ করতো না। খুকু কখনো আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে গুরুজনরা ওকে ডেকে সরিয়ে নিতেন।

খুকু অনেক সময় দুমদাম কথা বলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিত অনেককে। আমাদের রান্নাঘরে দেশলাই ফুরিয়ে গেছে, উনুন ধরানো যাচ্ছে না. খুকু অমনি ফস্ করে বলে ফেলতো, 'মাসীমা, সুনীলদার কাছেই তো দেশলাই আছে !' তখন আমি লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট খাই, বাড়ির লোক কেউ জানে না, সেই সময়ে পকেটে দেশলাই থাকার কথা কেউ বলে দেয়। আমি খুকুকে পরে এজন্য বকুনি দিতে যেতেই ও বলেছিল, 'বাঃ মাসীমা তো আগেই একদিন দেখে ফেলেছেন যে আপনি সিগারেট খান। তা হলে আর দোষ কি !'

পাড়ার মধ্যে কার সঙ্গে কার ভাব, কার সঙ্গে ঝগড়া, কে কার সঙ্গে গোপনে সিনেমায় যায়—এ সবও খুকু জানতো। তাই সবাই ভয়ে ভয়ে থাকতো, খুকু কখন কার সামনে কি বলে ফেলে ! খুকু কিন্তু কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কারুর গোপন কথা কখনো ফাঁস করে দেয় নি। অন্যদের তুলনায় ওর সরলতা ছিল বেশী। ভালো মন্দের ব্যবধানটাও ঠিক বুঝতো না। গুরুজনেরা যাঁরা এক সময় খুকুকে ভালোবাসতেন, বড় হয়ে ওঠার পর তাঁরাও খুকুকে অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

খুকুর উদ্ধত স্বাস্থ্য, সেটা ওর দোষ। তা ছাড়া ও পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারতে শুরু করেছে। তা ছাড়া ও নাকি চোর। প্রায়ই একখানা দুখানা বই না বলে নিয়ে চলে যায়। আমার দু'একটা বই কখনো কখনো অদৃশ্য হয়ে গেলেও আমি ওকে কখনো সন্দেহ করি নি।

খুকুর স্বভাবটা ছটফটে হলেও বুদ্ধিটা খুব তীক্ষ্ণ। স্কুলে পড়াশুনোয় ভালো ছিল। ওদের পরিবারটা সম্মানিত হলেও হঠাৎ ভাঙন ধরেছিল। ওর বাবা

মারা যান সামান্য অসুখে, এক দাদা আমেরিকায়—বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না—দিদি চাকরি করে আর খুব প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। শিগগিরই বিয়ে হবে— একটি ছোট ভাই অনেকটা জড়ভরত ধরনের।

ক্লাস টেনে উঠে খুকুও রীতিমতন প্রেম করে বেড়াতে লাগলো। তার নিন্দেয় কান পাতা যায় না। অথচ, মাঝে মধ্যে যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখনও সেই রকম সরল মুখ, বই পড়ার দারুণ আগ্রহ। কথা বলতে ভালো লাগে মেয়েটির সঙ্গে।

অন্যরা যাকে প্রেম কিংবা অসভ্যতা ভাবে, সেটা খুকুর ক্ষেত্রে ছিল সহজ মেলামেশা। গলির মোড়ে মোড়ে সদ্য-যুবারা আড্ডা মারে। মেয়েরা যখন সেখান দিয়ে যায়, মুখ নিচু করে থাকে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে না,—যেন কোনোক্রমে সেই জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলেই হলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার নিয়ম নেই। একমাত্র খুকুই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তো। ছেলেদের নাম ধরে ডেকে কথা বলতো। অনেক ছেলেই তার বাল্যকালের খেলার সাথী, তারা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুকু তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে নি। তাদের সঙ্গে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। ক্লাব ঘরে আগে ক্যারাম খেলেছে। কি জানি, সিনেমাতেও গেছে কিনা ওদের সঙ্গে! মেয়ে হয়েও সে ছেলেদের সঙ্গে সমান সমানভাবে মিশতে চেয়েছিল। গুরুজনদের চোখে সেটাই অন্যায়।

আমাদের বাড়িতেই ছাদের একখানা ঘর নিয়ে থাকতো দুই ভাই, অবনী আর সুবীর। মফঃস্বলের গরীব ঘরের ছেলে, কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করছে। খুব কষ্ট করে থাকতো ওরা। দুটি ছেলেই চমৎকার, খানিকটা আদর্শবাদী ধরনের। অবনী সদ্য বি এস সি পরীক্ষা দিয়েছে, তখনও রেজাল্ট বেরোয় নি, এরই মধ্যে নিজে কি একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে। ছোটভাই সুবীর তখনো কলেজে পড়ছে। ওরা দু' ভাই নিজেরাই রান্না করে খায়।

খুকু কখনো কখনো ওদের ঘরেও যেত গল্প করতে। ওদের চা বানিয়ে দিত কিংবা রান্নায় সাহায্য করতো। শুধু ব্যাচিলরের ঘরে কোনো মেয়ের যাওয়া আসায় পাড়ার লোকদের আরও চোখ টাটায়। সুনীতি রক্ষার নামে আসলে সেটা হিংসে।

একদিন শুনলাম, পাড়ার কয়েকটা ছেলের সঙ্গে অবনী খুব ঝগড়া করেছে।

অবনী ঠাণ্ডা স্বভাবের ছেলে, পড়ার মাস্তানদের ঘাঁটাঘাঁটি করা তাকে মানায় না। কিন্তু ব্যাপারটায় নাকি খুকু জড়িত।

দেশের অবস্থা সেই সময় বদলে গিয়েছিল অনেকটা। আগে যাদের বলা হতো পাড়ার ছেলে, তাদেরই নাম হলো পাড়ার মাস্তান। তারা কেউ হাতে লোহার বালা পরে, কেউ দাড়ি রাখে। গলার আওয়াজও হঠাৎ কর্কশ হয়ে গেছে। কিংবা ইচ্ছে করেই কর্কশভাবে কথা বলে। তাদের রীতিমতন সমীহ করে চলতে হয়, তারা কাউকে অপমান করছে দেখলেও প্রতিবাদ করা যায় না। ভদ্রলোকেরা সবাই তখন এই নীতি নিয়েছে যে মাস্তানদের ঘাঁটাতে নেই।

খুকু কিন্তু তখনো মেলামেশা ছাড়ে নি ওদের সঙ্গে। সেই রকমই হেসে হেসে গল্প করে। আবার কখনো ওদের ধমকাতেও দেখেছি। মাস্তানদের সঙ্গে খুকুর এই ভাব রাখাটা অবনী সহ্য করতে পারে নি। খুকুদের বাড়িতে শক্ত কোনো অভিভাবক নেই। তার মা নিরীহ মানুষ—সেখানে অবনীই হয়ে উঠলো অভিভাবকের মতন। মাস্তানরা এই নিয়ে আওয়াজ দেওয়া শুরু করলো অবনীকে।

তার কয়েকদিন বাদে শুনলাম, অবনী আর সুবীর খুকুদের বাড়িতেই খাবার ব্যবস্থা করেছে। বদলে টাকা দেয়। এর ফলে ওদের আর হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না, খুকুদেরও খানিকটা সাহায্য হবে। সেই সঙ্গে অবনী খুকুকে পড়াতে শুরু করেছে—সামনেই স্কুল ফাইন্যাল, সে যাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারে—

কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, খুকু আমার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো, 'আগরতলায় আপনি কোথায় থাকবেন ?'

—'সার্কিট হাউসে।'

—'আমি দেখা করবো আপনার সঙ্গে।'

—'নিশ্চয়ই এসো—'

— 'আপনি আমাকে দেখে রাগ করেন নি ?'

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো এই কথাটা। আমিও হাসিমুখে বললাম, 'না।'

—'আমি এখন যাচ্ছি। যদি পারি তো আবার আসবো—'

খুকুর চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। কেন বললাম 'না'। ওর ওপরে দারুণ রাগ করাই তো উচিত।

খুব মনে পড়ছে অবনী আর সুবীরের কথা। একটা সামান্য মেয়ের জন্য

ওদের জীবন কী ছন্নছাড়া হয়ে গেল। অথচ খুকুর মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্নও নেই।

অবনী দারুণ যত্ন করে পড়াচ্ছিল খুকুকে। তার মনোভাবটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুকু যাতে উচ্ছন্নে না যায়, সেদিকে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। খুকুকে সে লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরি করে নিচ্ছিল, তারপর সময় মতন বিয়ের প্রস্তাব করবে।

সুবীর ছিল খুবই লাজুক। তার মনের কথা কেউ জানতে পারে নি।

খুকু আমার কাছে আসতো গল্পের বই নিতে। যতক্ষণ থাকতো, গলগল করে অনেক কথা বলে যেত। তখন তার বেশীর ভাগ গল্পই অবনী আর সুবীর সম্পর্কে। দুজনকে নিয়েই সে মজা করতো সব সময় — ওদের চায়ে নুন মিশিয়ে দিত, সুবীরের অঙ্কের খাতার মলাট বদলে জব্দ করেছিল। এই সব বলতে বলতে খুকু ঝরঝর করে হাসতো। শুধু সেই নির্মল হাসিটুকুর জন্যই ওর ওপর রাগ করা যেত না।

পরীক্ষার মাত্র এক মাস আগে খুকু সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা করলো। এখনো সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তার মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার বিমানদার বিয়ে হয়েছে খুব ধুমধামের সঙ্গে। বিমানদার স্ত্রী আরতি দেখতেও যেমন সুন্দরী, স্বভাবটিও সেই রকম নম্র।

বিয়ে উপলক্ষে খুকু কয়েকদিন সারাক্ষণই প্রায় রয়ে গেল বিমানদার বাড়িতে। সবরকম কাজে সাহায্য করতেও সে ওস্তাদ। আরতি বৌদির সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল খুব। বিমানদার আর কোনো ভাই-বোন ছিল না, খুকুই যেন হয়ে গেল আরতি বৌদির ননদ।

বিমানদা অফিস যাবার পর নতুন বৌ বাড়িতে একা থাকে, তাই খুকুই হয়ে গেল তার প্রত্যেক দিনের সঙ্গী। সকালবেলা অবনীর কাছে পড়াশুনো সেরে নিয়েই খুকু চলে আসতো আরতি বৌদির কাছে। আরতি বৌদি প্রায়ই তাকে খাওয়ান। এমন কি আরতি বৌদি তাঁর বাড়িতেও খুকুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। উনি ওকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা আরতি বৌদি শখ করে খুকুকে তার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই! দাঁড়াও একটু স্নো আর পাউডার মাখিয়ে দিই।'

সেজেগুজে ফুটফুটে হয়ে উঠলো খুকু। আরতি বৌদির তাতেও তৃপ্তি হলো না। নিজের গয়নাগুলোও সব পরিয়ে দিলেন খুকুকে। তারপর তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'দেখাচ্ছে ঠিক যেন রাজকন্যা—ইস্, তোমার দাদা বাড়িতে থাকলে এই সময় তোমার যদি একটা ছবি তুলে রাখা যেত!'

আয়নার সামনে খুকু অনেকক্ষণ নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। এত ভালো শাড়ি তো বেচারী কখনো পায় নি। এরকম গয়নাও পরে নি। ওর চেহারাটা সুন্দর, ফুটফুটে মুখ—সাজগোজ করলে ওকে তো ভালো দেখাবেই।

খুকু বললো, 'বৌদি, আমার মাকে একটু দেখিয়ে আসবো?'

আরতি বৌদি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন, 'যাও না, দেখিয়ে এসো না—।'

এক পাড়ার মধ্যেই বাড়ি। দুপুরবেলা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, আর ফিরলো না।

আরতি বৌদি বিকেলবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কারুকে কিছু বললেন না। তারপর বিমানদা বাড়ি ফিরলে শুধু বললেন খুকুদের বাড়িতে একবার খোঁজ নিতে।

খুকুর মা আকাশ থেকে পড়লেন। খুকু দুপুরের পর একবারও বাড়িতে আসে নি। পাড়ার মধ্যেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি চলো। খবর নেওয়া হলো বিভিন্ন হাসপাতালে এবং থানায়। কোথাও নেই, খুকু যেন সম্পূর্ণ উপে গেছে।

ব্যাপারটা প্রথম বিশ্বাসই করা যায় নি। দিন দুপুরে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কি করে উবাও হয়ে যাবে? তার গায়ে অত গয়না ছিল বলে প্রথমেই মনে আসে যে কেউ হয়তো তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই বা কি করে হয়? বিমানদার বাড়ি থেকে খুকুদের বাড়ি মাত্র কুড়ি পঁচিশখানা বাড়ি পরেই। পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা। সেখান থেকে কে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

তখন স্বভাবতই মনে আসে, খুকু সোজা তার মায়ের কাছে না এসে অন্য কোথাও গিয়েছিল। চেয়েছিল আর কাউকে তার শাড়ি গয়না পরা চেহারা দেখাতে। কাকে? অবনীকে? কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িতেও সে আসে নি। দুপুরবেলা অবনী বা সুবীর কেউ বাড়িতে থাকে না। তাহলে কি খুকু নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে? আরতি বৌদির গয়না নিয়ে? তখন ওর বয়েস কতই বা,

বড় জোর আঠেরো উনিশ। সেই বয়ে সব একটি মেয়ের এ রকম ডাকাতে বুদ্ধি হবে, বিশ্বাস করা যায় না, কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

সেই সময় দেখেছিলাম আরতি বৌদির মহত্ত্ব। উনি দিনের পর দিন সান্ত্বনা দিতে যেতেন খুকুর মাকে। তিনি বলতেন, 'শাড়ি-গয়না গেছে যাক্, সে এমন কিছু না—শুধু খুকু ফিরে এলেই হয়।'

খুকুর মায়ের চোখ থেকে অনবরত জলের ধারা গড়াতো। এই দুঃসময়ে বিধবাকে সাহায্য করারও কেউ ছিল না।

দারুণ ধাক্কা পেয়েছিল অরুণী। যেন তার সমস্ত স্বপ্ন তছনছ করে দিয়ে গেছে ওই একটি মেয়ে। অরুণীর মুখের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল সব সময়ে ফ্যাকাসে একটা ভাব। যেন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছোট ভাই সুবীর এমনিতে চুপচাপ, সে এ ব্যাপারেও কোনো কথা বলে নি, আরও যেন চুপচাপ হয়ে গেল এবং অল্পদিন পরেই অসুখে পড়লো।

খুকুকে ফিরে পাওয়ার আশা যখন সবাই মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময়, প্রায় মাস দেড়েক পরে, খুকুর চিঠি এল কাশী থেকে। খুকু তার মাকে লিখেছে যে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাকে বিয়ে করতে চায়। গোবিন্দ জাতে তিলি—সেইজন্য এই বিয়েতে তার মায়ের আপত্তি আছে কিনা!

এত কাণ্ডের পর শুধু জাত নিয়ে মায়ের আপত্তি আছে কিনা এইটাই যেন বড় ব্যাপার! খুকু আরও লিখেছে যে গোবিন্দ খুব ভালো ছেলে এবং সে বলেছে পরে চাকরি করে সে আরতি বৌদির গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেবে।

চিঠি পেয়ে খুকুর মা শুধু কাঁদলেন, আর সবাই রাগে ফুঁসে উঠলো। সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন শাস্তি দিতেই হবে। বয়সের দিক থেকে খুকু তখনও নাবালিকা, সুতরাং পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা যাবে।

পাড়ায় ছেলেদের কাছ থেকে সন্ধান পাওয়া গেল, গোবিন্দ অন্য পাড়ার একজন মাস্তান। খুকুর সঙ্গে সঙ্গে সেও উধাও হয়ে গেছে ঠিকই, তবে যোগাযোগটা এতদিন বোঝা যায় নি।

একমাত্র আরতি বৌদিই পুলিশে খবর দেবার বিরোধী ছিলেন। তার ধারণা ছিল পুলিশ দিয়ে জোর করে ধরে আনতে গেলে খুকুর জীবনটাই বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত গয়না-চুরির অপবাদ তিনি কিছুতেই খুকুর নাম দিতে চান না একবার তিনি সবাইকে বললেন, ওই সব গয়না তিনি ইচ্ছে করে খুকুকে 'পদ্মফুলের

দিয়েছিলেন। খুকু যদি গোবিন্দকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে, তবে তাই হোক। তিনি আশীর্বাদ করবেন।

তবু পুলিশে খবর গেল। এবং পুলিশ কিছু করার আগেই অবনী ঠিক করলো সে তক্ষুনি কাশী চলে যাবে। এখন আবার মুখ চোখের চেহারা বদলে গেছে তার, এখন মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, খুকুকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

ট্রেন ধরার জন্য একটা সুটকেস হাতে নিয়ে সন্ধেবেলা অবনী বেরুতে যাচ্ছে, সেই সময় আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। অসুস্থ অবস্থাতেই সুবীর দাদার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে আর সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। পাগলের মত সে চেঁচিয়ে বলছে 'না দাদা, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না! ও আমাদের কেউ নয়। ওর জন্য তুমি যাবে না!'

অবনী ধমকে বললো, 'তুই চুপ কর। আমি কি করবো না করবো, তা তুই আমাকে শেখাবি?'

সুবীর বললো, 'তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা নষ্ট মেয়ের জন্য ছুটে যাচ্ছো?'

অবনী এক চড় মারলো তার ভাইকে।

চড় খেয়ে সুবীর একটুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অবনীর হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'না, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না—'

অবনী এক একবার ছোট ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে আবার সুবীর দৌড়ে গিয়ে তার পথ আটকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল—একটা টাক্সি দেখে তাতে এক সময় উঠে পড়লো অবনী।

সেইদিনই ভোর রাত্রে আত্মহত্যা করলো সুবীর।

ছাদের ঘরে একলা একলা শুয়ে থেকে কোন্ যাতনা তার মনে ছিল কেউ জানে না। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করার গ্লানি হয়তো সে সহ্য করতে পারে নি। কিংবা হয়তো গোপনে গোপনে সে খুকুকে তার দাদার চেয়েও বেশী ভালোবাসতো। খুকু ওরকমভাবে চলে যাওয়ায় সে-ই আঘাত পেয়েছিল বেশী। ভোর রাত্রে সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে।

খুকুর জন্য অনেকগুলি মানুষের জীবন বদলে গেছে। সেই খুকু এখন সেজে-গুজে কি রকম ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিমানের মধ্যে। সম্পূর্ণ অনাবিল মুখ।

অবনী কাশী থেকে ফিরে এসেছিল তিনদিন পরেই। খুকু তার সঙ্গে আসে নি। একদিন একটুক্ষণের জন্য তার সঙ্গে খুকুর দেখা হয়েছিল--তারপরই তারা অন্য কোথাও চলে যায়। অবনী যখন ফিরে এল, তখন সে একটি সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ। তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তক্ষুণি তাকে জানাতে কেউ সাহস পায় নি।

এর অল্পদিন পরেই খুকুর মায়েরা চলে যায় আমাদের পাড়া থেকে। অবনীও ফিরে যায় তার দেশের বাড়িতে। এত কাণ্ড করার পরও আরতি বৌদি এবং পাড়ার অন্য দু'একটি মহিলা কখনো বলে ফেলেছেন, যাই বলো মেয়েটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভালো ছিল। এত সরল মন, অথচ কেন যে এরকম একটা ব্যাপার করলো!

লোকের মুখে টুকরো টুকরো ভাবে আমি শুনেছিলাম খুকু ঠিক নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে যায় নি। আরতি বৌদির বাড়ি থেকে বেরুবার পর কোনো একটি ছেলে তাকে সিনেমা দেখাবার প্রস্তাব দেয়। খুকু লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখতো। তার বাড়িতে তো এমন কেউ ছিল না যে তাকে সিনেমা দেখাবে। তার দিদি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সব সময়।

আসলে অত দামী দামী শাড়ি-গয়না পরে মাথা ঘুরে গিয়েছিল খুকুর। মেয়েদের এরকম হয়। সে চেয়েছিল যতক্ষণ বেশী সম্ভব ওগুলো পরে থাকতে। সে জানতো, মাকে দেখাতে গেলেই তো মা বলবেন, যা, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়। তাই সে চেয়েছিল ওইগুলো পরে কিছুক্ষণ বেড়াবে, রাস্তায় ঘুরবে। সিনেমাতে যাওয়াও তো সেই জন্যই—লোকে তাকে দেখবে।

সিনেমা দেখার পর হোটেলে খাওয়াবার নাম করে কয়েকটি ছেলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। মোট চারটি ছেলে। তারপর গয়না বিক্রি করে নানান জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাশীতে। প্রথম যে ছেলেটি সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে হঠিয়ে দিয়ে খুকুর অধিকার নিয়ে নেয় গোবিন্দ। সেই গোবিন্দর সঙ্গেও খুকুর বিয়ে হয় নি শেষপর্যন্ত—এলাহাবাদের রাস্তায় হঠাৎ সে মারামারি বাধিয়ে দু'তিনটে লোকের মাথা ফাটায় এবং নিজেও আহত হয়। পুলিশ তাকে ধরে চালান করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। খুকু তখন একা ছিল। বছর খানেক পরে খুকুকে নাকি কলকাতায় দেখা গেছে আবার। আমি আর দেখি নি।

সেখান থেকে খুকু কোথায় গেল তা আমি আর জানি না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, খুকু ক্রমশই অন্ধকার জগতে চলে যাবে। ওদিকে যারা একবার যায়, তাদের তো ফেরার রাস্তা থাকে না। কিন্তু খুকু আবার একটা পদ্মফুলের

মতন ফুটে উঠেছে। চাকরি পেয়েছে যখন, নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে কিছুটা অন্তত। মুখে কোনো রকম পুরনো গ্লানির চিহ্ন নেই। ও কি ফিরে গেছে ওর মায়ের কাছে? আরতি বৌদির সঙ্গে আর কখনো দেখা করেছে? কিছুই জানি না। কৌতূহল হচ্ছে খুব, কিন্তু এখন তো ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। বিমলদা আর আরতি বৌদি এখন বোম্বেতে থাকেন। অবনী কোথায় আছে, খবর রাখি না।

আগরতলা এসে গেছে, সীট বেল্ট বেঁধে নেবার সংকেত জ্বলে উঠেছে। খুকু এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি ওর সিঁথির দিকে তাকালাম। সিঁদুরের চিহ্ন থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিবাহিতা মেয়েরা বোধহয় এয়ার হোস্টেস হতে পারে না।

আমি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'অবনীকে মনে আছে?'

খুকু হাসতে হাসতে বললো, 'হ্যাঁ, বাঃ মনে থাকবে না কেন? জানেন না, অবনীদা তো বিয়ে করেছেন ওঁরই এক প্রফেসারের মেয়েকে। ইলেকট্রিকাল গুড্‌সের ব্যবসা করছেন এখন, বেশ ভালো অবস্থা।'

—'তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, দু'একবার দেখা হয়েছে। ওর বিয়েতে তো নেমন্তন্নও খেতে গিয়েছিলাম!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাঝখানের ঘটনাগুলো কি তাহলে স্বপ্ন? গয়না চুরি, ইলোপমেন্ট, আত্মহত্যা— এতগুলো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ খুকুর মনে তার কোনো দাগই নেই? সে এমনভাবে কথা বলছে যেন তার সুদিনেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। সবকিছুই এমন স্বাভাবিক। শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ওর ওপর আমার রাগ আছে কিনা! অবনীকে সেই সময় দেখে মনে হয়েছিল, সে আর জীবনে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। জীবন এরকমভাবে বদলে যায়? বেচারা সুবীর! সে-ই শুধু হেরে গেল।

যাবার আগে খুকু বলে গেল, 'আপনার সঙ্গে সার্কিট হাউসে দেখা করবো কিন্তু!'

আগরতলায় আমি তিন চারদিন ছিলাম। এর মধ্যে খুকু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। নিশ্চয়ই সময় পায় নি। সে যে খুবই ব্যস্ত, আমি তা বুঝেছিলাম। দূর থেকে তাকে একদিন দেখেছিলাম সন্ধেবেলা রাজবাড়ির সামনের রাস্তায়, তার সঙ্গে আর তিন জন যুবক। খুকু হাসি মুখে হাত-পা নেড়ে তাদের

কি যেন বলছে, তারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। খুব সাজগোজ করে থাকলেও তার মুখখানা সরল ছেলেমানুষীতে ভরা। আর যুবক তিনটির মুখ দেখলে মনে হয়, তারা তিনজনেই খুকুকে যেন দেবীর মতন পুজো করতে প্রস্তুত।

তিনজন কেন একসঙ্গে? কোনো একজন পুরুষকে স্থিরভাবে ভালোবাসার ক্ষমতাই বোধহয় নেই খুকুর। কিংবা ও এখনো ভালোবাসতেই শেখে নি। ওর মনটা ঝরনার জলের মতন, কোনো আবিল নেই। কিংবা রাজহংসীর মতন যে-কোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে গেলেও ওর পালকে দাগ পড়ে না! আমি দেওঘরে একটা বাগানবাড়ির পুকুরে এই রকম একটি রাজহংসী দেখেছিলাম। পুকুরে অনেকগুলো সাধারণ হাঁসের মধ্যে একটি মাত্র রাজহংসী ছিল। রাজহংসীরা সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হয়। অন্য হাঁসগুলো তার চারপাশে ঘিরে থাকে, ঠিক যেন স্তুতি করে। আর রাজহংসীটি মাঝে মাঝে তার অহংকারী গ্রীবা তুলে ঠোক্কর মারে এক একজনকে। তখন রাগ হয় দেখে। কিন্তু আবার কোনো সময়ে, যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে রাজহংসীটি অনেক দূরে চলে যায়—টলটলে জলের মধ্যে তার নিখুঁত শরীর, একটি পালকও ভিজে নয়, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটি ছবি। কিংবা শিল্প। রাজহংসীটিও যেন দামী শাড়ি এবং গয়না পরে সেজে অহংকারী হয়েছে। সেই রাজহংসীটি ছিল খুকুর মতন, কিংবা খুকুই সেই রাজহংসীর মতন।

যুবক তিনটির সঙ্গে যখন খুকু কথা বলছিল, তখন তার শরীরে খুশীর হিল্লোল। যেন ও তাদের দয়া বিলোচ্ছে। অথচ সরল নিষ্পাপ মুখ। একসঙ্গে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে ও নিজে আনন্দ পায়—আর সেই ছেলেরাও প্রত্যেকে অসুখী হয়। এই ছেলে তিনটিও মরবে।

হঠাৎ খুকুকে দেখে আমার শেখভের 'ডার্লিং' গল্পের নায়িকার কথাও মনে পড়লো। সেই মেয়েটিও পুরুষের পর পুরুষ বদলে গেছে, অথচ তার সরলতা কখনো নষ্ট হয় নি।

দূর থেকে খুকুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির ওপর কি আমার রাগ করা উচিত? অথবা ঘৃণা? এর কোনোটাই আমার মনে এল না। আমি আপন মনে একটু হাসলাম।

হঠাৎ একটি নারী

প্রশান্ত দত্ত নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি সৎ লোক না অসৎ লোক ?

তিনি শুয়ে আছেন একটা ছোট চৌকিতে। নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় গাছের নিচে। বিশ্রী রকমের গরম—তবু গাছতলায় খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছেন তিনি এবং আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছেন পাশের বাড়িটার দিকে।

বাড়ি মানে কুড়েঘর, তারও খুব জীর্ণ দশা। এ বাড়িটাতে থাকে স্বামী-স্ত্রী আর একটা ছেলে। স্বামীটি অপদার্থ, দেখলেই বোঝা যায়। অল্প বয়েসে বুড়িয়ে যাওয়া চেহারা। ছেলেটার তেলতেলে মুখ, গোলগাল চেহারা—গ্রাম্য বালক যে রকম হয়। বউটি বয়সে বছর তিরিশ বত্রিশ হবে বোধহয়, সারাক্ষণ কাজ করে—সে একাই যে সংসার সামলায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারী ভালো মেয়ে। স্বামী-পুত্রের সেবা করাই তার একমাত্র কাজ।

কিন্তু বউটির স্বাস্থ্য একটু খারাপ হলে পারত না ? এত সুন্দর শরীরের গড়ন থাকার কি দরকার ছিল ? যে রকম দারিদ্র্য এদের—তাতে তো প্রায় ঘাস পাতা খেয়েই দিন কাটায় মনে হয়—তবু এমন স্বাস্থ্য পায় কি করে ?

প্রশান্ত দত্ত ওই বউটির শরীরের রেখা বিভঙ্গ থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। স্ত্রীলোকটিকে ঠিক রূপসী বলা যায় না। গায়ের রং পোড়া-পোড়া, চোখ নাক কিছুই নিখুঁত নয়—কিন্তু নিছক স্বাস্থ্যের যে একটা সৌন্দর্য আছে সেটা এর আছে পুরোপুরি। যে কারণে আকাশের একটা চিল সুন্দর, বুনো ঘোড়া সুন্দর, দেবদারু গাছ সুন্দর—সেই কারণেই এই স্ত্রীলোকটিকে সুন্দরী বলা যায়। শরীরে কোথাও কিছু অতিরিক্ত নেই—বুক, কোমর, উরু—সবকিছুই মানানসই।

স্ত্রীলোকটির কপালটাও বেশী চওড়া। প্রশান্ত দত্ত হাসলেন। যার কপালে এত দুঃখ-কষ্ট—তার কপাল এত বড় কেন হয় ? মেয়েটি পরে আছে একটা অতি ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি। এটাও একটা হাসির বিষয় নয় ? প্রশান্ত দত্ত দেখছেন শহরে কত বেঢপ চেহারার মেয়ে কত দামী দামী শাড়ি পরে সাজগোজ করে। যার পেটটা গণেশের মতন সে-ও পেট খোলা ব্লাউজ পরতে চায়—

মাড়োয়ারী মহিলাদের সাজগোজ দেখলে তো বমি আসে প্রায়। অথচ কয়লাখনি এলাকায় এমন অনেক মজুরনী দেখা যায় যাদের শরীর দেখলে মনে হয় মানবী মূর্তির আদর্শ—সাজগোজ করলে তাদেরই মানাবে—কিন্তু তাদের পরনের কাপড় জোটে না। এটা হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কি?

এই যে বাড়ির বউটি, এ একটি সৎ নারী। মুখ দেখলেই বোঝা যায় সৎ কিনা। প্রশান্ত দত্ত বিড়বিড় করে বললেন, শী ইজ আ গুড উয়োম্যান, নো ডাউট!

পৃথিবীতে যা কিছু সৎ তার প্রতি এখনো মানুষের একটা গোপন শ্রদ্ধা আছে। এই স্ত্রীলোকটির প্রতি প্রশান্ত দত্তরও শ্রদ্ধা হচ্ছে। বিশেষত এ এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও সৎ থাকতে পেরেছে। দারিদ্র্য তো শুধু অভাব আনে না, দারিদ্র্য মানুষকে বড় নীচ করে দেয়!

স্ত্রীলোকটির চরিত্রকে মনে মনে শ্রদ্ধা করলেও প্রশান্ত দত্ত এর শরীরের দিকে বার বার না তাকিয়ে পারছেন না। এবং সেই দৃষ্টির মধ্যে লোভ আছে।

সেইজন্যই প্রশান্ত দত্ত নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি নিজে কি? সৎ না অসৎ? আমি এই গেরস্ত ঘরের বউটির দিকে এরকমভাবে তাকাচ্ছি কেন? কেন না-তাকিয়ে পারছি না, আমার মধ্যে কাম প্রবৃত্তি বেশী। এটা কি দোষের ব্যাপার?

প্রশান্ত দত্ত নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু বলে মনে করেন। সে রকম মনে করার আপাত কারণও কিছু আছে।

প্রশান্ত দত্ত উদার এবং দয়ালু হিসাবে পরিচিত। পড়াশুনোতে নাম করা ছাত্র ছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বি এস সি ও এম এস সি তে তার সাবজেক্টে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। তার মোটামুটি একটা ভালো ধরনের সরকারী চাকরি। কিছুদিন চাকরি করার পর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পড়াশুনোতে তুমি যত ভালো হও—তোমার চাকরির উন্নতির একটা সীমা আছে। খুব বেশী উঁচুতে যেতে পারবে না। সে সব জায়গায় 'কানেকশান' ব্যাপারটাই প্রধান।

নিজের থেকেও অযোগ্য লোকের অধীনে চাকরি করার পাত্র প্রশান্ত দত্ত নন। ফট করে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করলেন। প্রশান্ত দত্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, ব্যবসা শুরু করার আগে তিনি তিন-চার মাস ধরে মার্কেট স্টাডি করেছেন, খাতা-পত্রে অঙ্ক মিলিয়েছেন। কম মূলধনে এমন ব্যবসা তাঁকে শুরু করতে হবে যাতে লাভ অবধারিত। শেষ পর্যন্ত তিনি এমন ব্যবসা শুরু

করলেন, যার সঙ্গে তাঁর বিদ্যে বুদ্ধি পড়াশুনোর কোনো সম্পর্কই নেই। গ্রাম-গ্রামাঞ্চল থেকে গরু ও শুয়োরের চামড়া সংগ্রহ করে চালান দেওয়া। প্রথমে সবাই তাকে ছি ছি করেছিল। এখন প্রশান্ত দত্ত বেলেঘাটায় মস্তবড় একটা ট্যানিং কারখানার মালিক।

প্রশান্ত দত্তর কারখানাটি সুপরিচালিত। তিনি নিজে সব সময় খাটেন। কর্মচারীরা অন্যান্য কারখানার চেয়ে বেশী মাইনে পায়, সুযোগ-সুবিধেও অনেক। কারুর কোনো অভিযোগ নেই। এই দরিদ্র দেশের বেশ কয়েকটি পরিবার প্রশান্ত দত্তর জন্য ভালোভাবে খেয়ে পরে আছেন। প্রশান্ত দত্ত মাঝে মাঝে ভাবেন, আমি যে এতসব করেছি, এর বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি ?

একটি অবাধ্য সাপ্লায়ারকে শিক্ষা দেবার জন্য প্রশান্ত দত্ত নিজে বেরিয়ে ছিলেন ইন্সপেকশনে। বর্ষার সময় এ দিককার রাস্তাঘাটে মোটর চলে না। গরুর গাড়ি কিংবা নৌকা ছাড়া উপায় নেই, প্রশান্ত দত্ত বড় সাইজের নৌকা নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই নৌকার তলার কাঠ সরে গেছে—যতক্ষণ না সারানো হয় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন গাছতলায়।

প্রশান্ত দত্তর সহকারী এই বাড়ি থেকে প্রথমে বাবুর বসার জন্য একটা চেয়ার-টেয়ার চেয়েছিল। ওরা দিতে পারে নি। কারণ ওদের বাড়িতে চেয়ার নেই। অনেক কিছুই নেই ওদের। গোটা বাড়িটা জুড়েই একটা নেই-নেই ভাব। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট খাট বার করে দিয়েছে—যেটা নিশ্চয়ই ওদের শোওয়ার খাট। একটা পায়া ভাঙা।

তারপর প্রশান্ত দত্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবে ? ওদের বাড়িতে চায়ের সরঞ্জাম নেই। ওরা চা খায় না।

ওদের বাড়িটা দোকান নয়, সেটা প্রশান্ত দত্ত জানেন। কিন্তু কোনো গেরস্ত বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে কিছু চাওয়ার রেওয়াজ তো একেবারে উঠে যায় নি।

চা খাওয়াতে না পেরে ওরা লজ্জা বোধ করে—তার বদলে লেবুর শরবত বানিয়ে নিয়ে আসে। প্রশান্ত দত্ত সে শরবত ছুঁয়েও দেখলেন না, কিন্তু এই পরিবারটি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

স্বামী, স্ত্রী আর একটা দশ-বারো বছরের ছেলে। স্বামীটি অকালবৃদ্ধ, নির্বোধ, অপদার্থ। ওর নাম দীন্ত ভট্টাচার্য। বউটির নাম বাসনা। নামটিতে বেশ মানিয়েছে বউটিকে।

প্রশান্ত দত্ত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন ওদের সঙ্গে। একটা জিনিস তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না—ওদের সংসার চলে কি করে! কোনো জমি-জমা নেই, লোকটির কোনো রোজগার নেই—তবু খেয়ে-পরে আছে তো দেখা যাচ্ছে। কতদিন থাকতে পারবে?

প্রশান্ত দত্ত একবার ভাবলেন, এদের একটু উপকার করবেন, স্বামীটিকে তিনি অনায়াসে একটি চাকরি দিতে পারেন। লোকটির যোগ্যতা যাই হোক, তবু মাসে ওর আড়াই শো তিনশো টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রশান্ত দত্তর পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু দীনু ভট্টাচার্য এ জায়গা ছেড়ে কলকাতায় চাকরি করতে যাবে না—লোকটা কলকাতা শহরকে ভয় পায়। তখন প্রশান্ত দত্ত প্রস্তাব দিলেন তার চামড়া সংগ্রহের ব্যাপারে ও স্থানীয় এজেন্ট হোক। কিন্তু গরু ও শুয়োরের চামড়ার কথা শুনে লোকটি আঁতকে উঠল। প্রশান্ত দত্তর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন একটি যমদূত। পেটের ভাত জোটে না অথচ জাত যাবার ভয় আছে।

প্রশান্ত দত্ত তখন বেশ রেগে গিয়েছিলেন। লোকটা যখন এতই অপদার্থ তখন ওর অমন একটা সুন্দরী স্ত্রী পাবার কোনো অধিকার নেই। এই স্ত্রীলোকটি নিজের সংসারের বাইরে কিছুই দেখে নি—সেই জন্য নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও জানে না। কিন্তু ওকে একটি স্ত্রীরত্নই বলা যায়।

আস্তে আস্তে প্রশান্ত দত্তর রাগ পড়ে এল। তিনি ভাবলেন ওদের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। এ রকম লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবার আছে দেশে—তিনি তার কি করবেন!

কিন্তু নৌকার মেরামত কাজ শেষ হচ্ছে না। একা একা শুয়ে থেকে আর কতক্ষণ ভালো লাগে। নৌকার মধ্যেই তাঁর জন্য রান্না চেপেছে। আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটাতে হবে।

প্রশান্ত দত্ত ছেলেটিকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বললেন। চেহারায় গ্রাম্যতা থাকলেও বেশ চালাক-চতুর ছেলে। ভালো করে লেখাপড়া শিখলে মানুষ হতে পারত। কিন্তু ওর ওই অপদার্থ বাবা কি আর বেশীদূর লেখাপড়া শেখাবে ছেলেকে?

তিনি তখন ভাবলেন, তাঁর কাছে ক্যাশ টাকা আছে শ চারেক। এর মধ্যে শ তিনেক টাকা তিনি ইচ্ছে করলেই এদের দান করতে পারেন। এদের যা অবস্থা—তিনশো টাকা তো প্রায় সাত রাজার ধনের সমান। দিয়ে দেখবেন নাকি কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়?

কিন্তু শুধু প্রতিক্রিয়া দেখার বদলে কি তিনশো টাকা দেওয়া যায়? অনেক পরিশ্রম ও মেধা খরচ করে টাকা রোজগার করতে হয়! এর বিনিময়ে তিনি যদি কিছু চান? কি? প্রশান্ত দত্ত নিজের মনের কাছে স্বীকার করলেন, স্ত্রীলোকটির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। স্ত্রীলোকটিকে ভোগ করতে পারলে মন্দ হত না।

পরক্ষণেই মন থেকে চিন্তাটা তাড়িয়ে দিলেন। এটা ঠিক নয়। গরীব হোক যাই হোক—এদের একটা মোটামুটি নিরুপদ্রব সংসার—সেটা তছনছ করে দেওয়া তাঁর উচিত নয়। এতে মানুষের আদিম মূল্যবোধে আঘাত করা হয়। তিনি তো পাষণ্ড নন্!

অথচ তার চোখ ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে ওই বাসনা নামের স্ত্রীলোকটির দিকে। তিনি উপভোগ করছেন ওর স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য। একবার ওর সারা শরীরে হাত বুলোতে পারলেও বেশ আরাম হত। কিন্তু তিনি যদি এই ইচ্ছেটা প্রকাশ করে ফেলেন—সবাই কি রকম ছি ছি করবে। গোপনে লুকিয়ে চুরিয়ে করলে কিছু আসে যায় না অবশ্য।

প্রশান্ত দত্তর স্ত্রী অনেক দিন ধরে হাঁপানির অসুখে ভুগছেন। দুটি ছেলে মেয়ের জন্ম দেবার পর তার শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। প্রশান্ত দত্ত স্ত্রীর অযত্ন করেন না, চিকিৎসার ত্রুটি নেই—এবং স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসাও আছে। কিন্তু তিনি ভোগী পুরুষ—সারাদিন তিনি কাজে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে ভোগ-বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লোকে একে লালসা বলবে! তিনি সামাজিক ও সজ্জন, শুধু নিজের পরিবার নয়, তাঁর কারখানার ওপর নির্ভরশীল অনেকগুলি পরিবারের প্রতি তিনি সুবিচার করেন—অথচ এর বিনিময়ে তিনি কিছু চাইতে গেলেই অপযশ হবে। তিনি যদি হোটেলে কোনো মেয়েমানুষ রাখেন—লোকে তাঁকে বলবে লম্পট। পারা যায় না! আর এই যে এখানে এই স্ত্রীলোকটির এমন চমৎকার শরীরটা নষ্ট হচ্ছে—সেটা অন্যায় না।

প্রশান্ত দত্ত ছেলেটিকে আবার কাছে ডাকলেন। ব্যাগ থেকে তিনশো টাকা বার করে বিনা ভূমিকায় ছেলেটিকে বললেন, তোমার মাকে দিয়ে এসো!

ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তিনি হুকুমের সুরে বললেন, যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার মাকে দিয়ে এসো।

ছেলেটি দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে যেতেই প্রশান্ত দত্ত উঠে বসে উৎফুল্লভাবে পা দোলাতে লাগলেন। বেশ একটা নতুন ধরনের খেলা পাওয়া গেছে। দীনু

ভটচাজ একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে—দেখাই যাক না টাকাটা পেয়ে তার বউ কি করে!

বাসনা ছেলের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, খানিকটা বিস্ময় ও উত্তেজনায়। বাসনা লাজুক নয়। সে বেশ স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি এতগুলো টাকা পাঠালেন কেন?

প্রশান্ত দত্ত অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের আমার খুব ভাল লেগেছে, তাই সামান্য কিছু দিলাম। এই ছেলেটির যাতে পড়াশুনো হয়—

—এতগুলো টাকা?

—বেশী নয়, সামান্যই—

—না, না, এ কখনো হয়!

বাসনা টাকাটা রাখল খাটের উপর। প্রশান্ত দত্ত মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তিনি এরকমই আশা করেছিলেন।

টাকাটা ওর স্বামীর হাতে দিলে সে নিশ্চয়ই ফেরত দিত না। খুব হাত কচলাতো। তাতে প্রশান্ত দত্তর কি লাভ হত। তিনি বউটির সঙ্গে একবার কথাও বলতে পারতেন না।

বাসনা চলে যাচ্ছিল। প্রশান্ত দত্ত ডাকলেন, শুনুন!

সে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রশান্ত দত্ত নম্র গলায় বললেন, আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভাল লাগত।

—আপনি তো ওকে চাকরির কথা বলেছিলেন?

—আমি কাঁচা চামড়ার কারবার করি বলে কি এ টাকা নিতে আপনার ঘেন্না হচ্ছে? টাকা কখনো অপবিত্র হয় না।

—না না, সে কথা তো বলি নি। এমনি এমনি কি এতগুলো টাকা কারুর কাছ থেকে নেওয়া যায়!

—তা হলে এর বদলে আমাকে কিছু দিন!

—দেবার মত কি আছে আমাদের বলুন!

প্রশান্ত দত্ত মনে মনে বললেন, তোমার শরীর। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করলেন না। এত স্পষ্ট কথা মানুষ সহ্য করতে পারে না। টাকার বিনিময়ে শরীরের কথা বলার মধ্যে একটা সাংঘাতিক রূঢ়তা আছে। তা হলে ভালোবাসা? ভালোবাসা সম্পর্কে প্রশান্ত দত্তর এককালে দুর্বলতা ছিল—এখন কাজে ব্যস্ত থেকে সময় পান না।

না। তিনি যদি একে বলেন, আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই! তুমি তা গ্রহণ করবে?

কিন্তু এরা এত গরীব, শুধু ভালোবাসা নিয়ে মেয়েটি কি করবে?

বাসনা ধীর পায়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। প্রশান্ত দত্ত সেই দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। তাঁর চোখে এখন লোভের চিহ্নমাত্র নেই। বরং বেশ খুশী খুশী ভাব। ঠিক যা যা হবার তাই হচ্ছে। মেয়েটি যদি টাকাগুলো নিয়ে নিত —তা হলে প্রশান্ত দত্ত ওকে অত পছন্দ করতে পারতেন না।

খাটের তক্তাগুলো ফাঁক ফাঁক। এই তক্তার ফাঁকে টাকাগুলো গুঁজে রাখলে কয়েকদিনের মধ্যে ওদের চোখে পড়বেই। তখন তো আর ফেরত দেবার কোনো উপায় থাকবে না। প্রশান্ত দত্ত একবার ফাঁকের মধ্যে টাকাগুলো ঢুকিয়ে পরীক্ষাও করলেন, কিন্তু রাখলেন না। এতটা মহৎ তাঁর পক্ষে সাজা অসম্ভব। তিনি তো সাধারণ মানুষ, দেবদূত তো নন। তাঁর কামনা-বাসনা আছে। সব কিছুরই একটা প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছে আছে।

ওর স্বামী ফিরলে নিশ্চয়ই বলবে টাকার কথা! সে তখন কি করবে? আপসোস করবে, বউকে বকুনি দেবে? মারধোর করবে না তো? এই সব অযোগ্য লোকরাও বউকে পেটাতে খুব ওস্তাদ। অযোগ্য পুরুষেরাই বউয়ের ওপর বেশী হম্বি-তম্বি করে। প্রশান্ত দত্ত ভাবলেন, তিনি কি মেয়েটির ওপর তার স্বামীর অত্যাচারের কারণ হলেন? সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে।

প্রশান্ত দত্তের সঙ্গে সব সময় একজন ঘনিষ্ঠ অনুচর থাকে। এর নাম রত্নেশ হালদার। এ প্রশান্ত দত্তর ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া বেশী দূর শেখে নি— এখন প্রশান্ত দত্তর কর্মচারী, তুই তুই বলে কথা বললেও কাজে সে শরীর-রক্ষী। সে গোঁয়ার ও শক্তিশালী, তার কোনো দুঃখবোধ নেই।

রত্নেশ নৌকার মাঝিদের ওপর চোটপাট করছিল, প্রশান্ত দত্ত তাকে ডেকে বললেন, কি রে, রান্না হল? ক্ষিদে পেয়ে গেছে আমার।

—হ্যাঁ, এই যে! হাত-মুখ ধুয়ে নিবি না?

—আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই নিয়ে আয়।

—খাবার ওইখানেই পাঠাব?

—হ্যাঁ।

—গাছের তলায়—পাখিটাখি যদি ইয়ে করে দেয়!

—কিছু হবে না—বেশ একটা নতুনত্ব হবে।

মুর্গীর ঝোল, ভাত। মুসলমান মাঝিরা ভালই রাঁধে। ঝাল একটু বেশী —প্রশান্ত দত্ত ঠোঁট সরু করে হুস-হাস করতে লাগলেন। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন ছেলেটি বাড়ির ভেতর থেকে একটা বাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাটিটা প্রশান্ত দত্তর সামনে ধরে সঙ্কুচিতভাবে বলল, মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাটি ভর্তি সাদা রঙের ডাল। মুগ-মুসুরী ছোলা নয়—প্রশান্ত দত্ত এ ডালের নাম জানেন না। একবার তিনি ভাবলেন ফিরিয়ে দেবেন, ডাল ফাল খাওয়ার কোনো উৎসাহ নেই তাঁর। কিন্তু কেউ খাবার পাঠালে ফেরত দেওয়া বোধ হয় খুবই অভদ্রতা। অযাচিতভাবে টাকা পাঠালে ফেরত পাঠানো হয়—কিন্তু খাবার পাঠালে ফেরত দিতে নেই।

অনিচ্ছার সঙ্গে বাটিটা নিয়ে তিনি চুমুক দিলেন। কিন্তু ভাল লাগল। ডালের মধ্যে উচ্ছে আর লাউের টুকরো দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ প্রশান্ত দত্তর মনে পড়ে গেল তাঁর মায়ের কথা। তাঁর মা এই রকম ডাল রাঁধতেন। মায়ের মৃত্যুর পর কখনো এই রকম রান্না খান নি। এই ডাল খেলে তার মনে হয় যেন শরীরের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাটির সবটুকু খেলেন চেটে-পুটে। এক অদ্ভুত ধরনের ভাল লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখে জল এসে গেল। নৌকায় কাঠ ফাঁক না হয়ে গেলে তিনি এখানে নামতেন না। গাছতলায় ঝিরঝিরে হাওয়া, গরম নেই আজ, নদীর জলে রোদ চকচক করছে—একজন দয়াশীল নারী নিজের হাতের রান্না পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁকে—এ সবই যেন সৌভাগ্যের মতন।

হাত ধুয়ে এসে সিগারেট ধরিয়ে তিনি ছেলেটিকে বললেন, তোমার মাকে আর একবার ডাকো তো।

বাসনা ইতিমধ্যে স্নান করেছে, তার চুলগুলো ভিজে। লজ্জিতভাবে এসে দাঁড়াল কাছে। প্রশান্ত দত্ত স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব তৃপ্তি পেলাম।

বাসনা মৃদু গলায় বলল, আপনার ভাল লেগেছে তো? আমাদের সাধারণ রান্না···ভাবলাম আপনি খাবেন কিনা?

—বহুদিন এরকম রান্না খাই নি। আপনার অনেক গুণ আছে। আপনাদের খাবার খেলাম, আপনাদের খাটটা দখল করে বসে আছি—কিন্তু জানি এর প্রতিদানে কিছু দেওয়া যায় না। দিতে পারলে ভাল লাগত—

প্রশান্ত দত্ত মনে মনে ভাবলেন, এই সব কথা রমণীটার গা ছুঁয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরে বলতে পারলে কত বেশী ভাল লাগত। কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও মেয়েটির সুগঠিত শরীরের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারলেন না।

বাসনা বাটিটা তুলে নিয়ে লজ্জিতভাবে বলল, এ তো সামান্য—

প্রশান্ত দত্ত প্রায় যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?

বাসনা ঠিক বুঝতে না পেরে চমকে মুখ তুলে বলল, কি।

প্রশান্ত দত্ত আবার দৃঢ়ভাবে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? এখানে আপনাকে মানায় না। আমি আপনার খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা করে দেব

বাসনার মুখখানা অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেল। সে আর একটা কথাও বলতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বলভাবে চেয়ে রইল প্রশান্ত দত্তর দিকে—তারপর প্রায় দৌড়েই চলে গেল বাড়ির মধ্যে। দূরে দেখা গেল দীনু ভটচাজকে আসতে।

প্রশান্ত দত্তর নিজের গালেই সাস ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে হল। কেন তিনি এ কথা বললেন। একটা সুন্দর ব্যবহার, একটা লাজুক দিনের স্মৃতি—এইটুকু নিয়ে চলে গেলেই কি হত না? ওই দীনু ভটচাজ জীবনে কিছুই পায় নি। —তবু একজন সুশীলা স্বাস্থ্যবতী রমণীকে পেয়েছে—সেটুকুও কেড়ে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন তাঁর? পৃথিবীতে কি আর নেই? কিন্তু একথা তিনি কোনোমতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না—এ জায়গায় ওই মেয়েটিকে মানায় না। দীনু ভটচাজের বদলে তারই প্রাপ্য ছিল ওই রকম একটি নারী! তিনি সত্যিই ওর যত্ন করতেন। অন্তত একবার একটু সাহচর্য পেলে কি ক্ষতি ছিল?

এরপর তিনি ভাবলেন, টাকার কথাটা বাসনা তার স্বামীকে নাও জানাতে পারে—কিন্তু একজন অচেনা লোকের কু-প্রস্তাবের কথাও কি স্বামীকে জানাবে না? তারপর কি প্রতিক্রিয়া হবে? সেটা দেখার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

খানিকটা বাদে দীনু ভটচাজ বেরিয়ে এসে বিগলিত মুখে প্রশান্ত দত্তর কাছে বসে নানান গল্প করতে লাগলেন। প্রশান্ত দত্ত তীক্ষ্ণচোখে দেখতে লাগলেন, লোকটা অভিনেতা কি না। সব জেনেশুনেও কি লুকোচ্ছে? না, তা হতে পারে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে আপনি আমার কাজটা নেবেন না?

—আজ্ঞে বামুনের ছেলে হয়ে গরু শুয়োরের চামড়া ঘেঁটে বেড়াব! দুটো টাকার জন্য কি বাপ পিতামহর ধর্ম ছাড়তে পারি? আপনার তো অনেক দিকে জানাশোনা—যদি আমার ছেলেটার জন্য কিছু।

তিনশো টাকার নোটের বাণ্ডিল থেকে মাত্র দশটাকার একটা নোট বার করে দীনু ভটচাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এটা রাখুন, আপনার ছেলের জন্য মিষ্টি কিনে দেবেন।

—না, না, এ আবার কেন?

—রাখুন, আপনার ছেলের জন্য।

দীনু ভটচাজ আগ্রহের সঙ্গেই টাকাটা পকেটে গুঁজল। প্রশান্ত দত্ত হাসলেন। তারপর বললেন, আমি চাষার মানুষ ভদ্রতা-সভ্যতা তো ঠিক জানি না, ভাবছিলাম, আমার টাকা নিলে যদি আপনার সম্মান যায়—।

প্রশান্ত দত্তর মাথায় আর একটা আইডিয়া এল। এর বউকে যদি কেউ কেড়ে নিয়ে যায়—দু'চারদিন ভোগ করার পর আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয়—তা হলে এ কি বউকে আবার গ্রহণ করবে? নাকি তখনও জাত-ধর্ম ধুয়ে খাবে? ওই বউয়ের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে লোকটা?

দীনু ভটচাজ চলে যাবার পর প্রশান্ত দত্ত রত্নেশকে ডেকে বললেন রত্নেশ এ বাড়ির মেয়েটাকে দেখেছিস?

রত্নেশ একটুও অবাক হল না। বলল, তখন দেখেছিলাম, নদীতে চান করছিল—ফিগারখানা দারুণ।

—সচরাচর দেখা যায় না

রত্নেশ ইঙ্গিত বুঝে বলল, কাছাকাছি আর কোনো বাড়িঘর নেই। এরা একা একা এখানে থাকে কি করে? চোর-ডাকাতের ভয় নেই?

—কি আছে এদের বাড়িতে যে চুরি-ডাকাতি হবে?

—কেন, মেয়েছেলের জন্য কি ডাকাতি হয় না? এ রকম মেয়েছেলে দেখলে অনেকেই।

প্রশান্ত দত্ত চিন্তিতভাবে বললেন, ঠিক!

সন্ধ্যের অন্ধকার নামতেই নৌকা চালু হল। প্রশান্ত দত্ত নৌকায় বসেছেন। রত্নেশ হঠাৎ বলল, আমি একটু আসছি।

রত্নেশ ঢুকে গেল বাড়িটার মধ্যে। দীনু ভটচাজকে সামনে দেখে বিনাবাক্য-ব্যয়ে তার চোখের ওপর একটা ও পেটে একটা ঘুষি বসাল। দীনু ভটচাজ

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। একটা বস্তা নিয়ে রত্নেশ নৌকায় উঠেই ঘরের মধ্যে চলে এল—মাঝিদের দাবড়ে বলল—শিগগির চালাও।

প্রশান্ত দত্ত ধড়ফড় করে উঠে বসে বললেন, এ কি করেছিস ?

—তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে, একটু সাধ মিটিয়ে নে।

—আমি তো আনতে বলি নি।

—আব চক্ষুলজ্জা কবে কি হবে। এমন কিছু ব্যাপার নয়, পরে ফিরিয়ে দিয়ে আসব এখন। গোটা তিরিশেক টাকা দিলেই হবে।

বাসনা বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে প্রশান্ত দত্তর দিকে। প্রশান্ত দত্ত বললেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস কবলাম—আপনি আমার সঙ্গে আসবেন কিনা। আপনি কোনো উত্তর দিলেন না তো!

বাসনা পাগলের মতন বলল, আমি বিষ খাব।

—বিষ আছে সঙ্গে? আমি তো আমার কাছে বিষ রাখি না। আমি আবার জিজ্ঞেস কবছি—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? ইচ্ছে হলে আপনার ছেলেকেও সঙ্গে নিতে পারেন।

—না!

—আপনাকে দেখে আমাব ভাল লেগে ছিল—কিন্তু জোর করে কোনো মেয়েকে ভোগ করা আমার স্বভাব নয়। রত্নেশ একে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

রত্নেশ বলল, তোব যদি পছন্দ না হয়, তা হলে আমি একটু জাপটা-জাপটি করি। এনেছি যখন -টাকা না হয় আমার পকেট থেকেই যাবে।

বাসনা প্রশান্তব দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে বলল, আপনি আমার এ সর্বনাশ করলেন কেন ?

প্রশান্ত দত্ত অত্যন্ত নীবস গম্ভীরভাবে বললেন, যে রকম ফাঁকা জায়গায় আপনাদেব বাড়ি—তাতে যে-কোনো দিন বদমাস লোকেরা আপনাকে হরণ করতে পারে। রত্নেশের স্বভাবটাও ডাকাতের মতন—ধরুন আজকে সেই রকমই একটা ব্যাপার হয়েছে। আপনার স্বামীব ক্ষমতা নেই আপনাকে রক্ষা করবার। আমি তো এখানে দর্শক মাত্র।

—আপনি দয়া করুন।

—দয়ার প্রশ্ন নয়। আপনার প্রতি আমার লোভ হয়েছিল—লোভী মানুষ কি দয়া করতে পারে ?

—আমি ভেবেছিলাম, আপনি ভাল লোক।

—আমারও ধারণা আমি ভাল লোক। কিন্তু ভাল লোকেদের কি কামনা বাসনা থাকতে নেই? আপনাকে যখন আমি টাকাটা দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু চাই নি। এ চাওয়াটা আলাদা।

প্রশান্ত দত্ত বিমর্ষভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর রত্নেশের দিকে রুক্ষভাবে তাকিয়ে বললেন, এটা বেলেল্লা করবার জায়গা নয়। শিগগির ওকে রেখে আয়—এই মুহূর্তে।

নৌকা থামানো হল। রত্নেশ মেয়েটিকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসতে গেল।

প্রশান্ত দত্ত ঘড়ি দেখে বললেন, দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবি। কোনো রকম বাজে কাজ করবি না।

রত্নেশ ফিরে আসবার পর প্রশান্ত দত্ত কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ওর স্বামী ওকে নেবে?

—কেন নেবে না?

—সাধারণত নেয় না।

—ধুৎ!

—জন্তু-জানোয়ারের চামড়া ছুঁলে যাদের জাত যায়—তারা কি অপর পুরুষের ভোগ করা বউকে ফেরত নেয়?

—ভোগ মানে? কিছুই তো

—সে কথা কে বিশ্বাস করবে?

—তোকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

প্রশান্ত দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে একবার দেখে আসতে হবে—ওর কি হল।

রত্নেশ আঁতকে উঠল, বার বার বোঝাতে লাগল যে এখন ফিরে যাওয়ার মধ্যে ঝুঁকি আছে, মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রশান্ত দত্ত গ্রাহ্য করলেন না—নৌকা থেকে নেমে গেলেন। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই কুড়েঘরের পাশে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। কুপীর টিমটিমে আলো—তার পাশে দীনু ভটচাজ বৌকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে।

প্রশান্ত দত্ত সরে এলেন সেখান থেকে। একবার নদী ও আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ ভর্তি তারা, নদীর জলে ছলছল ধ্বনিমাধুর্য! চমৎকার রাত। সেই সৌন্দর্যের দিকে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অপদার্থ!

চিরদিনের ঋণ

মেয়ের পদবী চ্যাটার্জি, মায়ের পদবী ধারিওয়াল আর মায়ের ঠাকুর্দার পদবী ছিল সিংহ। বিখ্যাত লোক ছিলেন তিনি। যে কোনো ইতিহাস বইয়ের পাতায় তাঁর নাম পাওয়া যাবে। বৃটিশ আমলে তিনি ছিলেন নামজাদা ব্যারিস্টার, ভারতীয় হয়েও তিনি বিলেতের কমন্স সভায় জ্বলন্ত ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে প্রথমবার কারারুদ্ধ করায় তিনিই দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে দেন।

সেই মানুষের নাতনীর মেয়ে আমি পড়াই দক্ষিণ কলকাতায় মস্ত গেটওয়ালা বাড়ি। গেটের পরে ছোট বাগান, তারপরে বাড়ির সামনে বিশাল কুকুর। সেই কুকুরের পাশ দিয়ে আমাকে ভেতরে ঢুকতে হয়। কুকুরটা চুপ করেই থাকে কিন্তু আমার বুক ঢিপঢিপ করে।

বাস থেকে নেমে খানিকটা রাস্তা আমাকে হেঁটে আসতে হয়। রাস্তার পাশের কল থেকে ভাল করে মুখটা ধুয়ে নেই। ঘনাক্ত মুখ নিয়ে ও বাড়িতে ঢুকতে লজ্জা করে। চটিতে যাতে কোনোক্রমে কাদা না লাগে সেজন্যও সাবধানে থাকতে হয়। ও বাড়ির প্রতিটি ঘরের সারা মেঝে জোড়া কার্পেট।

ও বাড়িতে বোধহয় তিনখানা বসবার ঘর। কজনা সব কটা ঘরই বসবার ঘর কিনা জানি না। প্রায় তিন চারটে ঘর পেরিয়ে আমাকে একটা ঘরে গিয়ে বসতে হত। প্রত্যেক ঘরই একই রকম সোফা কুশান দিয়ে সাজানো। বিরাট দেওয়ালগুলো শূন্য, একটাও ছবি নেই।

মেয়েটির নাম দেবযানী। খাতায় লেখা দেখেছিলাম দেবযানী চ্যাটার্জি। ওদের বাড়ির সামনে নেমপ্লেটে লেখা ছিল মিঃ সুরেশ ধারিওয়াল অ্যাণ্ড মিসেস শোভনা ধারিওয়াল। যিনি আমাকে কাজটা যোগাড় করে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখ, অমুক সিনহার ফ্যামিলিতে পড়াতে যাচ্ছ, যদি ওদের একটু নজরে পড়ে যাও, তোমার বরাত খুলে যাবে।

পরে জেনেছিলাম বিখ্যাত অমুক সিনহার নাতনীর প্রথম পক্ষের স্বামী বাঙালী ছিলেন, দ্বিতীয় পক্ষ এক পাঞ্জাবী, বর্তমান রাজস্থানী স্বামীটি তাঁর তৃতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষেই তাঁর একটি সন্তান হয়েছিল, এখনো ওই একমাত্র সন্তান।

মেয়েটির বয়েস ষোল। সিনিয়র কেম্ব্রিজে একবার ফেল করেছে। বাঙালী পদবী থাকলে আজকাল বাংলায় একটা পরীক্ষা দিতেই হয়। সেইজন্য আমাকে রাখা হয়েছে।

মেয়েটি এতই সুন্দরী যে দেখলে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যায়। গোলাপের পাপড়ির মতন গায়ের রং। বড় বড় দুটো চোখ স্থিরভাবে চেয়ে থাকে। হাতের আঙুলগুলো সত্যিই ফুলের কলির মতন। মেয়েটি পরে থাকে একটা প্যান্ট আর গেঞ্জি, গেঞ্জিটার সামনের দিকটা অনেকটা কাটা, সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তার নতুন দ্বীপের মতন স্তন। সেদিকে তাকাব না ভাবলেও বারবার চোখ চলে যায়।

দু'দিনেই বুঝতে পারলুম, মেয়েটির মাথায় কিচ্ছু নেই। ঠিক জড়ভরত বা হাফ উইট নয়। তার শরীরটা বেড়ে উঠলেও মনটা পাঁচ ছ বছরের শিশুর মতন অপরিণত। বিদ্যেও সেই পর্যন্তই। এ সারাজীবনেও সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করতে পারবে না।

এক মাস খুব মন দিয়ে পড়াবার চেষ্টা করলাম। তারপর মনে হল, মেয়েটির মা-বাবার সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। কিন্তু মা-বাবার দেখাই পাওয়া যায় না। দেবযানীর সৎ বাবাকে আমি দেখেছি মাত্র একবার। বেশ লম্বা চওড়া, শান্ত-গম্ভীর মাতাল। প্রায়-শেষ একটি হুইস্কির বোতল নিয়ে দু'নম্বর বসবার ঘরে একা একা প্লে-বয় ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। দেবযানীর মা আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেবার পর তিনি শুধু একটু মাথা নেড়েছিলেন, একটাও কথা বলেন নি। খুব সম্ভবত স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তানের শিক্ষা নিয়ে তাঁর একটু মাথাব্যথা নেই।

দেবযানীর মা-ও কিছু কম মাতাল নন। প্রথম দিনই মুখে গন্ধ পেয়েছিলুম। তা ছাড়া ঘোর-লাগা মানুষের মতন তিনি সব সময় মাথাটা একটু দোলান। বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্যটি এখনও ভাল। এককালে যে খুব রূপসী ছিলেন তার প্রমাণ এখনো শরীরে ধরে রাখতে চান।

প্রথম দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, মেয়েটি খুব কম বয়েস থেকেই হস্টেলে থেকেছে বলে বাংলাটা ভাল শেখে নি। সে যে কিছুই ভাল শেখে নি, সেটা তিনি জানেন না। কি একটা গোলমালের জন্য মেয়েকে হস্টেল থেকে নিয়ে আসতে হয়েছে।

শোভনা ধারিওয়াল ঈষৎ জড়ানো গলায় সেদিনই আমায় জানিয়েছিলেন,

এককালে তিনি নিজে খব বাংলা বই-টই পড়তেন। শবৎবাবুর শেষের কবিতা বইখানা—আমি মৃদু গলায় জানিয়েছিলাম, ববীন্দ্রনাথের।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ববিবাবুব শেষ প্রশ্ন, চমৎকাব বই, কি যেন নাম মেয়েটার, বিনোদিনী, হাউ নাইস—

এব পব তাঁব আব বিশেষ দেখা পাই নি। কোনো কোনোদিন দেখেছি, আমি থাকতে থাকতেই তিনি এক দঙ্গল লোক নিযে বাড়ি ফিবলেন, তাবপরই পার্টি শুরু করে দিলেন। দারুণ হৈ-হুল্লোড়, তাব মধ্যে মেয়েব লেখাপড়া সংক্রান্ত আলোচনা কবা যায় না। আবাব দিনেব পব দিন তাঁকে বাড়িতে দেখাই যায় না।

দেবযানীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, অনুনয় বিনয় করে পড়তে বলি, সে কিছুতেই পডবে না। শুধু মিটিমিটি হাসে। এক লাইনও লিখতে চায না সে। কিছু লিখতে বললেই বলে, আপনি লিখুন না! এমন একটা সুন্দব মেয়েকে বকুনি দেওয়া যায় না।

বোকাদেরও এক ধবনেব দুষ্টু বুদ্ধি থাকে। দেবযানীব সে বকম দুষ্টবুদ্ধি অনেক ছিল। প্রথম প্রথম দেখতাম, ও আমাব হাতের ওপর নিজের হাত রাখছে। ভাবতাম সরল বলেই এসব কিছু বোঝে না। আমি হাত সবিয়ে নিতাম।

কয়েকদিন পরে টেবিলের তলায় ওব পা দিয়ে আমার পায়েব সঙ্গে খেলা শুরু করল। প্রথমে আমি চমকে উঠেছিলাম। কয়েকবার এ রকম কবাব পর আমাকে বলতেই হল, এ কি করছ দেবযানী?

উত্তর না দিয়ে ও ফিকফিক করে হাসে। তখন মৃদু ধমক দিতেই হয়। তাও শোনে না। আমি পা সবিয়ে নিলেও ও লম্বা কবে নিজেব পা এগিয়ে দেয়। তখন আমাব ভয় ভয় করে।

বাড়িতে ওব মা বাবা কেউ নেই। নির্জন ঘরে একটি সুন্দরী মেয়ে আমাব সঙ্গে দুষ্টুমী করছে। আমাব বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে আওয়াজ হয়। নিজেকে সামলাতে পাবব তো? ওব সঙ্গে তখন আমার বয়েসের তফাত সাত আট বছরের। আমাব কান গরম হয়ে ওঠে। চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকে, তবু নিজেকে সামলে আমি চেয়ারের ওপর পা তুলে নিই।

এক একদিন দেবযানী এমন জামা পরে আসে, যে-জামার কাজ শরীরকে ঢেকে রাখা নয়, বেশী করে দেখানো। হাজার সংযমের চেষ্টা করেও ওর বুকের দিকে না তাকিয়ে পারি না। তাতে ও একটুও লজ্জা পায় না। বরং আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও নিজেই নিজের বুক দেখে আর আপন মনে হাসে।

দেবযানীর আরও একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল নিজেই নিজের ডান বাহুতে চুমু খেত। সব জামাই হাত-কাটা। নগ্ন বাহু দুটি কি পেলব আর নরম। হঠাৎ সেই হাতের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে দেবযানী। যেন অন্য কাউকে আদর করছে। মেয়েদের ঠোঁটের ওরকম ব্যবহার দেখলেই গা শিরশির করে। নিজের হাতে ওরকম চুমু খেতে আমি আগে কাউকে দেখি নি। সেই সময় আমি ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ট্রেন দুর্ঘটনা এই সব বিষয়ে চিন্তা করে মনকে অন্যদিকে সরাতে চাইতাম।

ওদের বাড়িতে তিন চারজন ঝি-চাকর। তারা থাকত অনেক দূরে। একজন ঝি এক সময়ে এসে আমাকে এক কাপ চা দিয়ে যেত। আর একজন চাকরকে মাঝে মধ্যে দেখতাম. বেশ গাঁটাগোট্টা জোয়ান মতন, আমারই বয়েসী, কালো চকচকে গায়ের রং। দেবযানী তাকে ডাকত রঘুবীর বলে। রঘুবীর অনেক সময় বিনা কারণেই এ ঘরের মধ্য দিয়ে চলে যেত—আমার ক্ষীণ সন্দেহ হত, ও বোধহয় আমার ওপর নজর রাখছে। পড়াশোনা শেষ করে আমি চলে আসবার সময় রঘুবীরই আসত দরজা বন্ধ করে দিতে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। দেবযানীর বাবা-মা কেউ বাড়ি নেই, কখন ফিরবেন ঠিক নেই—সেই সময় নির্জনে দেবযানীর সঙ্গে থাকবে ওই এক জোয়ান চাকর কি রকম যেন একটা অস্বস্তি হয়।

প্রথম মাস শেষ হবার পর একদিন দেবযানী আমাকে একটা খাম দিয়ে বলল, মাম্মি দিয়েছে আপনাকে। ছাত্রীর হাত থেকে টাকা নিতে বিষম লজ্জা লাগে। খামটা না খুলেই পকেটে রেখে দিলাম। বাড়িতে এসে খুলে দেখলাম, খামের মধ্যে টাকা নেই, একটা পঁচাত্তর টাকার চেক। মহা ঝামেলায় পড়লাম। আমার কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টই নেই। বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞেস করে বেড়াতে লাগলাম, কি করে ওই টাকা তোলা যায়। শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হল।

এর দু'দিন বাদে দেবযানীর মা আবার এক দঙ্গল লোক নিয়ে ফিরলেন। একটা আলমারি খুলতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, ওঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে. আপনার স্যালারিটা দেওয়া হয় নি—।

হাতব্যাগ খুলে চেকবই বার করে উনি প্রায় লিখতে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, না না, আপনি তো পরশুই আমাকে দিয়েছেন—

দিয়েছি? সত্যি?

আমি বললাম, দেখুন, দেবযানীর পড়াশুনোর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার ছিল—

উনি ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, সে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

ভদ্রমহিলা তখন রীতিমত মাতাল। আমার কথা শোনবার সময় নেই। দেবযানী আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভারত বিখ্যাত ব্যক্তির পরিবারের আজ এই অবস্থা।

দু'দিন বাদে ব্যাঙ্ক থেকে চেকটা ফেরত এলো। সই মেলে নি কিংবা টাকা নেই, কি যেন একটা ব্যাপার। চেকটা পকেটে নিয়ে এলাম। কিন্তু দেবযানীর মা'র দেখা পেলাম না। ছাত্রীর কাছে টাকা পয়সার কথা বলা চলে না।

পর পর কয়েকদিন চেকটা পকেটে নিয়ে যাই আবার ফেরত নিয়ে আসি। একদিন মাত্র দেবযানীর মায়ের দেখা পেয়েছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে এত লোকজন ছিল যে লজ্জায় কিছুতেই টাকার কথা বলতে পারলাম না। বলা যায় না। বুকের মধ্যে একটা অভিমান জমে থাকে শুধু। টাকাটা ওঁদের কাছে খুবই সামান্য, কিন্তু আমার কাছে অনেক।

পরের দিন আবার গেলাম। মন-মেজাজ ভাল নেই। মনে হচ্ছে, টাকার কথাটা আমি কোনোদিনই বলতে পারব না। তাহলে কি এই রকমই মাসের পর মাস উনি আমাকে চেক দিয়ে যাবেন, আমি তা ভাঙাতে পারবো না? হঠাৎ আলো নিভে গেল। এ রকম হয় মাঝে মাঝে, দশ পনেরো মিনিট বাদে আবার জ্বলে ওঠে। সেই সময়টা চুপচাপ বসে থাকি। সারা বাড়িতে কোনো শব্দ নেই, অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি আর টেবিলের উল্টো দিকে একটি নির্বোধ রূপসী মেয়ে। মেয়েটি আবার সেই সময়ে পা দিয়ে আমার পায়ের সঙ্গে খেলা শুরু করে।

আমি বললাম, দেবযানী, এ রকম কর না!

ও শুধু হাসে। অন্ধকারের মধ্যে চেপে ধরে আমার হাত।

মেজাজটা খারাপ ছিল বলেই আমি বললাম, আজ তবে আমি যাই।

দেবযানী চটাস্ চটাস্ শব্দ করে নিজের বাহুতে দুটো চুমু খেল।

এই সময় একটা রুপোর বাতিদানে একটা বড় মোম জ্বালিয়ে নিয়ে এল রঘুবীর। তাকে দেখেই দেবযানী হাসতে হাসতে বলল, মাস্টার সাব হামকো কিস্ খায়া!

আমি কোনো প্রতিবাদ করার আগেই রঘুবীর ঠক্ করে বাতিদানটা টেবিলের ওপর রেখেই আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, আভি নিকালিয়ে!

আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর। তাছাড়া কোনো বাড়ির চাকরের সঙ্গে মারামারি করতে হবে, একথা ভাবলেই ঘেন্না আসে।

আমি দেবযানীর দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন এ রকম মিথ্যে কথা বললে?

পাগলের মত দেবযানী হি হি করে হাসতে লাগল। আর রঘুবীরের গায়ের সঙ্গে নিজের শরীরটা লেপ্টে বলতে লাগল, মারো মৎ! মারো মৎ!

রঘুবীর আমাকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, আমি তাকিয়ে দেখলাম, আর কেউ আমাকে দেখছে কিনা। যদি কেউ দেখে, যদি কেউ কিছু শোনে, আমার কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের কথাই সবাই সত্যি বলে মেনে নেয়।

হন হন করে চলে এলাম বড় রাস্তায়। তারপর একটা লাথি খাওয়া কুকুরের মতন হাঁপাতে লাগলাম। লজ্জায় ঘৃণায় রাগে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। একবার ভাবছি ছুটে গিয়ে ওই বাড়িটাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আসি। কিছুই করলাম না। খানিকটা বাদে ফিরে এলাম।

আর কোনোদিন যাই নি। একবার ঠিক করেছিলাম সব কথা জানিয়ে দেবযানীর মা কে একটা চিঠি লিখব। তারপরই আবার একটু ভয় ভয় করেছে। উনি নিশ্চয়ই ওর চাকর আর মেয়ের কথাই বিশ্বাস করবেন। আমার চিঠি যদি উনি পুলিশে জমা দিয়ে কোনোক্রমে আমাকে খুঁজে বার করেন!

বহুদিন পর্যন্ত এই অপমানের গ্লানি বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি। বাতিল চেকটা পকেটেই রয়ে গেছে। প্রতিকারের কোনো পথ পাই নি। তারপর একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেবযানীর মায়ের ঠাকুদার একটি জীবনী-গ্রন্থ দেখলাম। তাঁর একটা ছবিও রয়েছে। প্রশান্ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা। সেদিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, আপনার কাছে আমাদের দেশ অনেকখানি ঋণী। আপনি এ দেশের জন্য অনেক কিছু দান করেছেন। সেইজন্যেই, আপনার পরিবারের কিছু ঋণ যদি আমার কাছে থাকে, তাতে কিছু আসে যায় না।

টেলিগ্রাম

ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে বসে কাজ করছিল সুবিমল, সামনে লম্বা লাইন, এই সময় পিয়ন এসে বললো, স্যার, আপনার টেলিগ্রাম। সই করে নিন।

লাইনের একেবারে সামনের প্রৌঢ়টির মুখে খুব স্পষ্টভাবে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো। এখন টেলিগ্রাম পড়ে বাবু হয়তো লাফিয়ে উঠবেন আনন্দে কিংবা কপাল চাপড়াবেন দুঃখে। হয়তো এক্ষুনি ছুটতে হবে বাড়িতে কিংবা স্টেশনে। অন্য লোককে বসাতে হবে কাউণ্টারে! নানা ঝামেলা, অন্তত আধঘণ্টা দেরি।

প্রৌঢ় লোকটি মুখ ফিরিয়ে বললেন, ব্যাঙ্কে এসে নিজের টাকা তুলবো, তাও এক ঘণ্টা সময় নষ্ট।

কথাটা সুবিমলের কানে গেল। সে টেলিগ্রামটা সই করে নিয়ে পাশে রেখে দিল। খুলে দেখলো না। প্রৌঢ় লোকটিকে বললো, দিন, আপনার চেক দিন।

এতটা বাড়াবাড়ি সেই প্রৌঢ় লোকটিরও সহ্য হলো না আবার। তিনি বললেন, আপনি টেলিগ্রামটা দেখে নিন না।

সুবিমল গম্ভীরভাবে বললো, দরকার নেই। দিন, দিন, পেছনে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রৌঢ় লোকটি চলে যাবার পর, তাঁর পেছনের লোকটি হাত বাড়াবার আগেই একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে নিজের কাগজটা বাড়িয়ে দিল। মেয়েরা এখানে লাইনে দাঁড়ায় না, পাশ থেকে হাত বাড়ায়।

মেয়েটির ঝলমলে পোশাক, শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। সুবিমল মেয়েটির দিকে একবার চোখ তুলতেই মেয়েটি মুখ গম্ভীর করলো। অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিতে চায়, ব্যাঙ্কের সামান্য কোনো কর্মচারীর জন্য সে তার হাসি খরচ করতে চায় না।

সুবিমল দ্রুত হাতে কাজ সারতে লাগলো। তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে, কিন্তু কোনো কাজে সামান্য ভুল হলেই বিপদ। মাত্র তিন মাস হলো চাকরিতে ঢুকেছে সুবিমল, এখনো কনফার্মেশান হয় নি।

মাসের প্রথম, এখন ব্যাঙ্কে খুব ভিড়। দুটো পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। টেলিগ্রামটা পড়ে বইলো পাশে। এক সময় হাওয়ায় উড়ে সেটা নিচে গড়িয়ে গেল, সুবিমল লক্ষ্য করলো না।

লাইনের শেষ লোকটিকে বিদায় করতে গিয়ে সুবিমলের দুটো কুড়ি বেজে গেল। তার সহকর্মীরা অনেকেই তখন উঠে পড়েছে। সুবিমল নতুন চাকরিতে ঢুকেছে বলে এখনো বিশেষ কেউ তার বন্ধু হয় নি।

এই সময় অনেকেই টিফিন খেতে বাইরে চলে যায়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে টিফিন কৌটো নিয়ে আসে। প্রবীণ জগৎবাবুরা কৌটো থেকে লুচি আর আলুর দম নিয়ে মুখে পুরছিলেন, সেই অবস্থাতেই বললেন, ও মশাই, আপনার পায়ের কাছে কি একটা পড়ে রইলো যে! কাগজপত্তর সাবধানে রাখবেন, এখানে ভুলো মন হলে চলে না!

সুবিমল চমকে গিয়ে মুখ নিচু করলো। তার সেই টেলিগ্রামটা। সেটা তুলে নিয়ে বুক পকেটে রেখে অবহেলার সঙ্গে বললো, এটা আমার নিজের কাগজ। দরকারী কিছু না!

ডাক বিভাগের খামের মধ্যে বন্দী আছে কোন সাংঘাতিক খবর, সুবিমল তা জানে না এখনো। সাংঘাতিক খবর ছাড়া, তার নামে টেলিগ্রাম আসবেই বা কেন?

নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে এসেছে। সুবিমলের চেনা-জানা সে রকম আর কেউ নেই, যে তাকে হঠাৎ টেলিগ্রাম পাঠাবে। তা ছাড়া, তার এই ব্যাঙ্কে চাকরি পাবার খবর অনেকে জানেই না এখনো।

টিফিনে সুবিমল পয়সা খরচ করে অত্যন্ত টিপে টিপে। হোটেল রেস্টুরেন্টে ঢোকে না। ফুটপাথ থেকেই খাওয়া সেরে নেয়। ব্যাঙ্ক থেকে একটু দূরে চলে গিয়ে ঝালমুড়ি, বাদাম, বাতাবি লেবু এইসব খায়। সিগারেট খরচ করে গুণে গুণে।

সুবিমল মাইনে পায় সাড়ে চারশো টাকা। এর থেকে আড়াইশো টাকা বাড়িতে পাঠাতেই হয়। বাকি দুশো টাকা—শুনতে অনেক টাকা হলেও, কলকাতা শহরে একজন লোকের পক্ষে চালানো বেশ কষ্টকর। রোজ পরিষ্কার জামাকাপড় পড়তেই হয় তাকে। ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে সে তো আর বস্তিতে থাকতে পারে না। মেসেই লেগে যায় শ দেড়েক। তার ওপর আছে যাতায়াত আর হাত খরচ।

প্রথম চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পেয়ে সুবিমলের এই সাড়ে চারশো

টাকাকেই মনে হয়েছিল দারুণ সৌভাগ্যের মতন। তা তো হবেই, কারণ, বর্ধমানে তার দেশের গ্রামের স্কুলে এর আগে মাস্টারী করতো সুবিমল, মাইনে পেত একশো সাতাশ টাকা, তাও প্রতি মাসে জুটতো না। বি কম পাস করে বহুকাল বসে থেকে, বহু চাকরির দরখাস্তের জন্য টাকা খরচ করে, নৈরাশ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে নিতে বাধ্য হয়েছিল ওই মাস্টারী। এবং এক সময় মনে হয়েছিল, সারা জীবন তাকে ওইভাবেই কাটাতে হবে। পড়াশুনোতে বরাবরই ভালো ছেলে ছিল সে, স্কুলে কখনো ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয় নি। সবাই বলতো, এ ছেলে বড় হয়ে দারুণ কিছু হবে। বি কম পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও সে আর এম কম্ পড়ার খরচ যোগাতে পারে নি, ওই মাস্টারীটাই ছিল জীবনের চরম সার্থকতা।

ব্যাঙ্কের চাকরির পরীক্ষাটা দেওয়ার এক বছরের মধ্যেও কোনো খবর না আসায় সে ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর কোনো এক বর্ষণসিক্ত দুপুরবেলা গামের পিওন ভিজতে ভিজতে এসে এই চমৎকার চিঠিখানা দিয়েছিল।

সুবিমলের হঠাৎ মনে হলো, তার বুকের কাছটা খুব গরম লাগছে। বুক পকেটে রাখা আছে টেলিগ্রামটা। এখনো খোলে নি।

এখন খুলে দেখবে? না, থাক। আড়াইটে বাজে, এক্ষুনি অফিসে ফিরতে হবে। ব্যাঙ্কের পুরনো কর্মীরা অনেকেই টিফিনের পর বেশ দেরি করে ফেরে। কেউ কেউ ফেরেই না। কিন্তু সুবিমল নতুন এসেছে, তার কনফার্মেশন হয় নি, কোনো ছুতোয় যদি তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়? আরও হাজার হাজার বেকার হাঁ করে আছে। না, সুবিমল কোনো সুযোগ দেবে না।

বাকি সময়টুকু সুবিমল মুখ বুজে কাজ করে গেল, কোনোরকম ভাবান্তর দেখালো না। কেউ জানে না, তার পকেটে কি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করে আছে।

অফিস ছুটির পর সুবিমল হাটতে লাগলো মেসের দিকে। এই সময় ট্রাম-বাসে খুব ভিড় থাকে বলে সে রোজ হেঁটেই যায়। পয়সাও বাঁচে। টেলিগ্রামটা মেসে পৌঁছেই না হয় পড়া যাবে।

কিন্তু এখন, এক মুহূর্তের জন্যও সে টেলিগ্রামটার কথা ভুলতে পারছে না। এখন অফিসের কাজের ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে রাস্তা পার হবার সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে। না, এরকমভাবে তার মরা চলবে না। সে মরলে, চাকরিটা বাঁচবে কি করে?

খুব তাড়াতাড়ি খবর পাঠাবার জন্যই তো টেলিগ্রাম। নইলে তো চিঠিই লেখা হত। টেলিগ্রাম পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে দেখাই নিয়ম। সুবিমল তবু এত দেরি করছে কেন? সুবিমল নিশ্চিত জানে, টেলিগ্রাম মানেই দুঃসংবাদ। যতদূর পারা যায় দুঃসংবাদটাকে দূরে ঠেলে রাখা।

সুবিমল তন্ন তন্ন করে ভেবে দেখছে, কোনোরকম সুসংবাদ পাবার সম্ভাবনা তার নেই। তা হলে কি হতে পারে?

তার বাবার অনেক দিনের পুরনো হাঁপানি। হাঁপানি রুগীরা সহজে মরে না। তার মা-ই পুরো সংসারটা চালান। মাকে কোনোদিন অসুখে ভুগতে দেখে নি সুবিমল। চরম দুর্দশার দিনেও মা ছেলেমেয়ের মুখে দুটি ভাত তুলে দিয়েছেন, কোনোদিন বাবার নাম কোনো অভিযোগ করেন নি। মায়ের কি কিছু হয়েছে? হয়তো মায়ের শরীরের মধ্যে অনেক অসুখ ছিল, মা তো কাকেক কিছু বলেন না নিজের সম্বন্ধে। না, না, মা সব কিছু হতেই পারে না।

তার ছোট ভাই বিল্টু এখনো স্কুলে পড়ে। দু' মাইল দূরে স্কুল, হেঁটে যেতে হয়। বিল্টু দারুণ দুরন্ত। একবার পুরুত মশাই হাত দেখে বলেছিলেন, চোদ্দ বছর বয়েসে বিল্টুর জলের ফাঁড়া আছে। বিল্টুর কত বছর এখন, তের না চোদ্দ? বিল্টু নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে । না, না, না—বিল্টুর মতন অমন প্রাণোচ্ছল ছেলে, ভাবাই যায় না।

সুবিমলের দিদির বিয়ে হয়ে গেছে ছ'সাত বছর আগে। আজ ব্যাঙ্কের কাউন্টারে যে মেয়েটির মুখের দিকে সুবিমল কয়েক পলক তাকিয়ে ছিল, সেই মেয়েটির সঙ্গে তার দিদি বাণুর মিল আছে। টেলিগ্রামটা পেয়ে প্রথমে দিদির কথাই কেন জানি তার মনে পড়েছিল।

অবশ্য, ব্যাঙ্কের ওই মেয়েটির মতন দিদির মুখে আর আগেকার লাবণ্য নেই। দু' বছর আগে বিধবা হবার পর দিদির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

যথাসাধ্য খরচ করে দিদির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দিদির ভাগ্যে সুখ নেই। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে গেল দেড় বছরের বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে দিদি ফিরে এসেছিল এ বাড়িতে। তার শ্বশুর-বাড়িতে কেউ তাকে আর এখন পছন্দ করে না। সে অলক্ষ্মী, স্বামীকে খেয়ে ফেলেছে।

তখন সুবিমলদের দারুণ দুরবস্থা। বাবার রোজগার বন্ধ, সুবিমল বেকার। নিজেদেরই সংসার চলে না। মা জোর করে দিদিকে আবার ফেরত পাঠিয়ে

দিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। বলেছিলেন, বোকা মেয়ে, নিজের অধিকার তুই ছাড়বি কেন ?

ফিরে যাবার সময় দিদি বলেছিল, দেখো, আমি একদিন ঠিক আত্মহত্যা করবো। দিদি ছেলেবেলা থেকেই খুব জেদী। দিদি কি সত্যিই···। না, না, দিদির একটা ছেলে আছে। সেই ছেলের কথা ভেবেও অন্তত···

মেসে ঢুকবার মুখেই সত্যসুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সুবিমলকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, ও মশাই, আপনি রাঁধতে জানেন ?

সুবিমল একটু অবাক হয়ে বললো, না, ঠিক মানে, কেন বলুন তো ?

—রান্নার ঠাকুরের খুব অসুখ। আজ নিজেদের মধ্যেই কারুকে রান্নায় হাত না লাগালে আজ আর খাওয়া জুটবে না।

—তাই নাকি ? কিন্তু আমি তো রান্নায় কখনো—

—আপনাকে একা রাঁধতে হবে না। সঙ্গে আর একজন কেউ থাকবে।

সুবিমল মিনমিন করে বললো, আচ্ছা তা হলে না হয় —

সত্যসুন্দরবাবু আবার আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করলেন, ঠিক আছে। আপনি তাস খেলতে জানেন ?

এবার আরও অবাক হয়ে সুবিমল বললো, তা একটু একটু জানি—কেন বলুন তো ?

—তাস খেলতে জানলে রাঁধতে হবে না। আমাদের সুখেন্দু দারুণ রাঁধে, সে সব করে দিতে পারে বলেছে। কিন্তু সুখেন্দু রান্নাঘরে ঢুকলে আমাদের তাস খেলার যে একজন লোক কম পড়বে !

সুবিমল বললো, আমি রান্না না তাস খেলা, কোনটা ঠিক ভালো পারবো, বুঝতে পারছি না।

—যান তা হলে, হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে একটু চিন্তা করে নিন। সাতটার মধ্যে মন ঠিক করে ফেলবেন।

সুবিমল নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো। জামাটা খোলার আগে টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বের করে নিল হাতে। খামটা খুলতে গেলেও থেমে গেল। সে জানে, টেলিগ্রামটা খুললেই আর তার রান্না কিংবা তাস খেলার কোনো প্রশ্নই থাকবে না। তাকে ছুটতে হবে স্টেশনে। বাড়ির সবাইকে সে ভালবাসে। কোনো একজনের বিপদের খবর পেলেই সে আর কলকাতায় বসে থাকতে পারবে না।

কিন্তু অফিসে ছুটির কি ব্যবস্থা হবে ? এখনো সে টেম্পোরারি, এই অবস্থায়

কি ছুটি পাওয়া যায়? এই কারণেই কি তার চাকরি যেতে পারে না? সে এখনো পার্মানেন্ট হয় নি। ইউনিয়ন তার হয়ে লড়বে না।

সুবিমল আর চিন্তা করলো না। টেলিগ্রামটা না খুলেই সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো সেটাকে। কাগজের কণিগুলো উড়িয়ে দিল জানলা দিয়ে। সে জানতে চায় না, সে জানতে চায় না।

পরক্ষণেই বুকের মধ্যে মুচড় উঠলো তার। যেন সে নিজের হাতে কাকুকে মেরে ফেললো। কাকে? বাবা, মা, বিন্টু না দিদি? কে?

সুবিমল প্রায় চীৎকার করে, অথচ মনে মনে বললো, কাকুকে না। আমি কাকুকে মারতে চাই না। আমি বাঁচাতে চাই শুধু আমার চাকরিটাকে। ওটা না থাকলে কেউ বাঁচবে না।

সেই ছেলেটি

ম্যাক্সমুলার ভবনের সভাকক্ষে কবিতা বিষয়ক উত্তপ্ত আলোচনার ঝড় বইছিল। এরই মাঝখানে কারুকে কিছু না ব'লে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরের প্রশস্ত অলিন্দে কয়েকটি চেয়ার ও সোফা কৌচ পাতা, একটিও মানুষ নেই। তাঁর পরিচিত একজন মহিলাও সেই সময় বেরিয়ে এসেছিলেন সভা থেকে। অরিন্দম সেই দীর্ঘ দীপিতা মহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন কিন্তু মহিলাটি বেশীক্ষণ বসলেন না। তখন একা একটি চেয়ারে বসে অরিন্দম সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন। একা থাকলেই তাঁর মুখখানি বিষাদময় হয়ে যায়।

অরিন্দমের বয়েস আটত্রিশ। সুপুরুষ বা সুদর্শন নন, কিছুটা স্থূলত্ব কমাতে পারলে তাঁর চেহারাটিকে চলনসই বলা যেতে পারতো। মেয়েরা এই রকম চেহারার পুরুষদের স্বপ্ন দেখে না। আবার পরিচয় হ'লে অপছন্দও করে না।

প্রথম যৌবনে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখে খানিকটা সুনাম ও দুর্নাম অর্জন করেছিলেন, সুনামের চেয়ে দুর্নামের ভাগ বেশি হওয়ায় তাঁর নাম বেশ অনেকদূর ছড়িয়ে যায়। এখন অবশ্য তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেই পরিচিত, দু-তিনটে উপন্যাস ফিল্ম হয়েছে, পুজো সংখ্যাগুলির অনেক পাতা তিনিই ভরান, বছরে ছ-সাতখানা করে বই বেরোয়, কলেজের মেয়েরা দল বেঁধে তাঁকে দেখতে আসে। প্রথম প্রথম অলেখক তরুণ সমাজ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাদের মুখপাত্র মনে করতে লাগলেন, এখনকার যৌবনের কথা তিনিই যেন একমাত্র তুলে ধরছেন—এই রকম একটা ভাব। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম ক'রে যাওয়ায় এরা অনেকেই আবার তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। এবং জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্ভুত ধরনের কাঁচা গল্প লেখাতেও বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তবু কবিতার পুরনো গন্ধ এখনো গায়ে লেগে আছে ব'লে এই ধরনের কবিতা সভায় তাঁর ডাক পড়ে। আগে অরিন্দম এই সব সভায় খুব হৈচৈ করতে

ভালোবাসতেন। এখন কোনো রকম আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না। এ সবই তাঁর মনে হয় যাঁকা মানুষদের কোলাহল।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় একা একা ব'সে ব'সে সিগারেট টানছিলেন, এমন সময় একটি কিশোর কিংবা সদ্য যুবা—অর্থাৎ আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রথম যৌবনের সমস্ত লাবণ্য ও তেজ তার মুখে মাখা রয়েছে, খুব সরু প্যান্ট ও সাদা রঙের শার্ট পরা। সে বললে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন, ছেলেটি জিজ্ঞেস করবে, এখন কটা বাজে কিংবা মিটিঙটা কোথায় চলছে—এই ধরনের কোনো সাধারণ প্রশ্ন। তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ, বলো।

—আপনি এত বেশি লেখেন কেন?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি জনপ্রিয় এবং তাঁর চেহারাও অনেকের কাছে পরিচিত, সেই জন্যই একটু চমকে গিয়ে বললেন, কি?

—আপনি এতো বেশি লেখেন কেন?

—তুমি কি আমাকে চেনো?

—হ্যাঁ, চিনি।

—আচ্ছা, আর লিখবো না।

—আপনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না।

—আমি কি উত্তর দিতে বাধ্য?

—হ্যাঁ।

—বললাম তো, আর লিখবো না। ক্ষমা চাইছি।

—এটা কোনো উত্তর হলো না।

—আমি যদি আর একদম না লিখি, তুমি খুশি হবে?

—সেটা কোনো কথা নয়। আপনার লেখা আমার ভালো লাগতো?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় চকিতে ভেবে নিলেন, এই বয়েসি ছেলেটি কবে থেকে তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলো, কবে ভালো লাগলো এবং কবে থেকেই বা খারাপ লাগতে শুরু করলো? তারপর তাঁর মনে পড়লো, তিনি নিজেই এগারো-বারো বছর বয়েসে 'চরিত্রহীন' এবং 'শেষের কবিতা' পড়েছিলেন—পরে আর ও বই দুটো হাতে নেন নি—কিন্তু এখনো মনে আছে।

এই ছেলেটি ভালো ছেলে। এই ছেলেটির গলার স্বর উত্তপ্ত হ'লেও আসলে

লাজুক! এই বয়েসের ছেলেরা লাজুক না হ'লে ভারী বিশ্রী হয়। তিনি বললেন, উনিশ শো তিয়াত্তর সালের এপ্রিল মাস থেকে আমি আবার বদলে যাবো।

ছেলেটি বললো, আপনি এমনিতেই অনেক বদলে গেছেন।

—আমি আবার বদলে যাবো।

—উনিশ শো তিয়াত্তরের এপ্রিল থেকে কেন? ওই বিশেষ সময়টার কোনো মানে আছে কি? কি রকমভাবে বদলাবেন?

—তোমার নাম কি?

—অর্ণবজ্যোতি সেনগুপ্ত

—তুমি কি নিজে লেখো? আমি তোমার কোনো লেখা পড়ি নি।

—পড়বার সময় কোথায় আপনার? অবশ্য, আমার তেমন কোনো লেখা ছাপা হয় নি এখনো। সে সম্পর্কে কিছু বলতেও আসি নি। আমি আপনার সম্পর্কেই—

আনন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় দোষশূন্য মানুষ নন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ব্যবহারে কখনো কখনো গুরুতর ত্রুটি দেখা গেলেও তাঁর একটি গুণ স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে তার কোনদিন কোনো ন্যাকামি ছিলো না। তিনি নিজের কোনো লেখা সম্পর্কে কোনদিন নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও মতামত জিজ্ঞেস করেন নি। কখনো বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের কাছে উপদেশ নিতে যান নি। তাঁর প্রশংসা বা নিন্দা সম্পর্কে যে সব রচনা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় সেগুলোর পাতা উল্টেও দেখেন না। মুখোমুখি কেউ কিছু বলতে এলেও তিনি পাশ কাটিয়ে যান। তিনি ভদ্র ও বিনয়ী হিসেবে পরিচিত হ'লেও এক এক সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন।

এই ছেলেটিকে তিনি এক কথায় বিদায় ক'রে দিতে পারতেন, কিন্তু ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভালো লাগলো।

—তাহ'লে অনেক কিছু বলতে হয়। আমি ওই সময়-সীমাটা নিয়েছি, কারণ এর মধ্যে আমাকে দু-একটা খুন করতে হবে।

ছেলেটি চমকালো না। বললো, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আমি এর আগেও কয়েকটা খুন করেছি। আমাকে দেখে বোঝা যায় না? তুমি নিজেই তো বললে, আমি বদলে গেছি। এবার দরকার সেই হত্যাকারীদের খুন করা। তাহ'লে যদি আবার বদলাতে পারি।

—আপনি পারবেন না।

—তুমি কি আমার কাছে এসে একটু বসবে? আজ আমার মনটা খারাপ। অর্ণবজ্যোতি, তুমি কারুকে ভালোবাসো, নিজেকে ছাড়া?

—আমি নিজেকে ভালোবাসি, একথা কে বললো ?

—তোমার বয়েস বোধ হয় আমার ঠিক অর্ধেক তাই না ?

—বয়েসের প্রশ্ন তোলার কোনো মানেই হয় না। আপনার কাছে যা জিজ্ঞেস করছিলাম তার কোনো উত্তর পেলাম না।

এমন সময় দুটি ফুরফুরে চঞ্চলা মেয়ে এসে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললো আপনার অটোগ্রাফ দেবেন ?

অটোগ্রাফ দিতে অরিন্দম কখনো কোনো আপত্তি করেন নি। ওই ছেলেটির উপস্থিতির জন্যে তিনি খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন নইলে সাধারণত এই সব অল্প বয়েসের মেয়ে যখন সঙ্গ তিনি বেশ উপভোগ করেন। আজ যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সেরে নিতে চাইলেন কিন্তু মেয়েটি সেই সুযোগে সঙ্গে কিছু লিখিয়ে নিতে চায়।

অরিন্দম মুখ তুলে দেখলেন অণুজ্যোতি চলে গেছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করলেন। বঞ্চিত মানুষের মতন কেতো ঠোঁটে তিনি ধরালেন আর একটি সিগারেট। মনে মনে বললেন অণুজ্যোতি, অণুজ্যোতি, এরই মধ্যে চলে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। আমার কোনো বন্ধু নেই, এমন কেউ নেই যার কাছে আমার দুঃখের কথা বলতে পারি—তুমি কি আমার বন্ধু হ'তে পারতে না ? যে আবেগে আমি কোনো নারীর ওষ্ঠ চুম্বন করি, ঠিক সেই রকম আবেগের সঙ্গে তোমাকে ভালোবাসতাম। আমি যা পারি নি, তুমি কি তা পারবে ?

সেদিন রাত্রে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্বপ্ন দেখলেন। সাহিত্যে বর্ণিত স্বপ্ন সাধারণত খুব জটিল এবং শিল্পগন্ধী হয়, কিন্তু এই স্বপ্নটি খুব সাধারণ। অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরে গেছেন তাঁর উনিশ বছর বয়েসে, অনেকটা অণুজ্যোতির মতনই চেহারা আর একটু হৃষ্টপুষ্ট, মাথার চুল বেশি। সেই অল্প বয়েসি অরিন্দম একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, নিঃস্ব। বিশেষত্বহীন এক সদ্যযুবক, মুখ নিচু করা, প্যান্টের পকেটে হাত, ছেঁড়া চটি। হাঁটতে হাঁটতে একটা গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকালো ওপরের দিকে, রাস্তার চার দিকে দেখলো, তারপর থুঃ ক'রে ঘৃণার সঙ্গে থুতু ছুঁড়ে দিলো সেই বাড়ির দেয়ালে। তারপর বাড়িটার মধ্যেই ঢুকে গেলো।

পরদিন সকালবেলা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই মানুষ রয়ে গেলেন —শুধু সকালবেলাটা তাঁর মন খারাপ রইলো।

গল্পের নায়িকা

আগে থেকে হোটেল ঠিক করা ছিল না, তাই মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল, পুরী পৌঁছে থাকবার জায়গা পাবো কিনা। কিন্তু উপস্থিত হয়ে দেখলাম, পুরী প্রায় ফাঁকা। আসন্ন বেল [illegible] কেউ এখন [illegible] বেড়াতে যাচ্ছে না।

টুরিস্ট লজের দোতলায় একটা চমৎকার ঘর পাওয়া গেল। দোতলায় প্রায় আর কোনো ঘরেই লোক নেই। আমরা [illegible] খুশি হলাম। কলকাতার ভিড় থেকে পালাবার জন্যই তো এ রকম বাইরে বেড়াতে আসা।

আমাদের কাজ হলো শুধু সমুদ্রের ধারে বসে থাকা। সকাল, দুপুর, সন্ধে, এমন কি অনেক রাত পর্যন্ত। নির্জন সমুদ্রতীর। অবিরাম ঢেউয়ের খেলা দেখতে একটু ক্লান্তি আসে না। গরম নেই, বেশ মেঘলা মেঘলা হাওয়া। কখনো বালির ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকি, তখন মনে হয়, কতদিন আকাশ দেখি নি। 'চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যায় পাখি'।

শান্তা বললো, এখানে একটাও লোক নেই, বিশ্বাসই করা যায় না, তাই না?

আমি বললাম, তোমার কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে নাকি?

শান্তা. মোটেই না। আমার তো মনে হচ্ছে সমুদ্রটা যেন শুধু আমাদের নিজস্ব।

—তোমার ভালো লাগছে তো?

—দারুণ ভালো লাগছে। তোমার?

—আমারও।

আসলে কিন্তু আমরা কেউই সত্যি কথা বলছিলুম না। দিন দুয়েকের মধ্যেই আমাদের বেশ একঘেয়ে লাগছিল। জল যেমন জলকে টানে, মানুষও তেমনি মানুষকে চায়। পরিপূর্ণ নির্জনতা পছন্দ করে সন্ন্যাসীরা। আমরা তো সন্ন্যাসী নই।

তৃতীয় দিনেই আমরা একজন প্রতিবেশী পেয়েছিলাম। সমুদ্রস্নান সেরে ফিরে এসে আমি বারান্দার চেয়ারে একটা বই খুলে বসেছি। একটু পরেই

নিচেই ডাইনিংহলে খেতে যেতে হবে, তার আগে একটু বই পড়ে নিলে আমার খিদে বাড়ে। এই সময় দোতলার কোণের ঘর থেকে একটি যুবক বেরিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করলো, তারপর ধীরপায়ে হেঁটে আসতে লাগলো আমাদের দিকে।

আমি উৎসুকভাবে যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের ভাবটা এমন করে রইলাম, যা [illegible] একটা কথা [illegible]। কিন্তু যুবকটি আমার কাছাকাছি এসেই [illegible] নিয়ে [illegible] ভাবে চলে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি রীতিমতন অপমানিত [illegible]। সচরাচর [illegible] আলাপ করা আমার স্বভাব নয়। [illegible] আমাকে [illegible] করে [illegible] গেলেই আমার পাঁচটারি করা [illegible]। শান্তা [illegible] আমার [illegible] দলছে, আমি লম্বা বারান্দাটায় পায়চারি করতে লাগলাম।

হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার শেষপ্রান্তে এসেছি তখন যেন [illegible] শুনতে পেলাম, বন্ধ ঘরটার মধ্য থেকে কাপড়কাচার শব্দ আসছে। আর চুড়ির টুংটাং শব্দটা খুব আস্তে হলেও আমার কান এড়ালো না। কিন্তু ঘরটি তো বাইরে থেকে তালাবন্ধ। এইমাত্র যুবকটিকে দেখলাম তালা আটকাতে। এ আবার কি ব্যাপার? নিঃসন্দেহ হবার জন্য আমি দরজার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে সত্যিই কাপড়কাচার ধুপধাপ শব্দ আর চুড়ির টুংটা শব্দ।

বেশ একটা গল্প করার মতন বিষয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে শান্তাকে বললাম, কোণের ঘরটায় একটা মেয়ে আছে।

শান্তা আমার কথায় অবাক না হয়ে বললো, তুমি বুঝি ওই দিকে ডাকাত কি মারতে গিয়েছিলে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না না

শান্তা মুচকি হেসে বললো, তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। মেয়েটিকে দেখতে কেমন?

আমি বললাম, দেখতেই তো পেলাম না ঘরটার বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

শান্তা বললো, তালাবন্ধ ঘরের মধ্যেও তুমি একটা মেয়ে দেখে ফেললে। তোমার কি এক্স-রে আই নাকি!

ব্যাপারটা শান্তাকে বোঝানোই গেল না। তখন আমি বিরক্তি হয়ে বললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলো খেতে চলো।

খাবারঘরের এক প্রান্তের টেবিলে যুবকটিকে দেখতে পেলাম। দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। আমরা ছাড়া খেতে এসেছে আর কয়েকটি সাহেবমেম। ওরা সেদিন সকালেই এসে পৌঁছেছে একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে। ওরাই হৈচৈ করে সরগরম করে রেখেছে জায়গাটা।

আমাদের খাবারের অর্ডার দেবার পর আমি সেই যুবকটির দিকে ইঙ্গিত করে শান্তাকে চুপি চুপি বললাম আমি একটু আগে ওই ছেলেটির কথাই বলছিলাম।

শান্তা বললো, ছেলে! তুমি তো একটা মেয়ের কথা বলছিলে।

— ওই ছেলেটা একটা মেয়েকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে এসেছে আর নিজে একলা এখানে বসে খাচ্ছে।

– তুমি পরের ব্যাপারে এত নাক গলাও কেন?

– বাঃ এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার না?

এরপর থেকে সমুদ্রের বদলে ওই তালাবন্ধ ঘরটাই আমার কাছে বেশী আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠলো। শান্তার চোখ এড়িয়ে আমি বিকেলের দিকে আরও দু একবার ঘুরে এলাম বারান্দার ওই দিকটায়। কোনো সন্দেহই নেই যে ওই ঘরে একটি মেয়ে আছে আমি নির্লজ্জের মতন দরজায় কান লাগিয়ে শুনেছি ভেতরে ফিসফিসানি কথা।

ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় বলেই মনে হলো। একটি ছেলে যদি একটি মেয়েকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যায় এবং তারা যদি স্বামী স্ত্রী না হয়, তাহলে পৃথিবীতে কার কি আসে যায়? কেই বা বুঝতে পারছে? তাহলে এত লুকোচুরি কেন? ট্রাভিস্ট লজের বেয়ারারা এবং ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানে। মেয়েটি নিশ্চয়ই না খেয়ে নেই, কোনো একসময় তার জন্য খাবার আসে। শুধু অন্য লোকজনের চোখের আড়ালে রাখার উদ্দেশ্য কি?

পরদিন সকালবেলা ছেলেটি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আমি দ্রুত হেঁটে গিয়ে ওকে ধরলাম। পাশ দিয়ে নামবার সময় খুব চেনা ভঙ্গি করে বললাম, আজ কি রকম মেঘ করে এসেছে, দেখেছেন?

ছেলেটি দারুণ চমকে উঠলো। তারপর একটু কঠোর মুখভঙ্গি করে ইংরেজিতে বললো, ইয়েস!

অর্থাৎ ছেলেটি আমাকে বোঝাতে চায় যে ও বাঙালী নয়। যাতে আমি ওর সঙ্গে গায়ে-পড়ে কথা বলা বন্ধ করি। কিন্তু ছেলেটি যে বাঙালী, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। চুল আঁচড়াবার ভঙ্গি দেখেই বাঙালী চেনা যায়।

আমি ছেলেটিকে সাহায্য করতেই চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম ওর ভয় ভেঙে দিতে। অসামাজিক কোনো কাজ করতে গেলে সাহস থাকা চাই। সাহসী লোকেরাই সমাজের নিয়মকানুন ভাঙে। কিন্তু ছেলেটি আমাকে পাত্তাই দিল না।

দুপুরবেলা শান্তা আমাকে বললো, তুমি সমুদ্রে যাবে না?

আমি তখন একটা বই খুলে বসেছি বারান্দার ইজিচেয়ারে। আকাশে চমৎকার মেঘ।

আমি বললাম, না, আজ আর ইচ্ছে করছে না।

শান্তা শাড়ি ও তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে বললো, সকালেও তো বেরোও নি। সারাদিন এখানে বসে থাকবে নাকি? চলো, আমার সঙ্গে চলো—

আমি তখন গোয়েন্দার মতন রহস্য সমাধানের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলাম। বন্দী মেয়েটিকে অন্তত একপলকের জন্যও আমার দেখা দরকার। কোনো না কোনো সময় সে কি বাইরে বেরোবে না? এ কখনো হয়?

শান্তাকে এ সব কথা বলি নি আর। অন্য একটি মেয়ে সম্পর্কে এত উৎসাহের কারণ কি ওকে জানানো যায়?

আমি বললাম, তুমি আজ একাই স্নান করে এসো না।

শান্তা এবার দারুণ রেগে গিয়ে বললো, একা যাবো? আমি পুরীতে এসেছি একা একা স্নান করার জন্য।

রাগ করে শান্তা শাড়ি আর তোয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, ওকে সামলাতে হলো। বই মুড়ে রেখে ওর সঙ্গে চলে এলাম সমুদ্রের পারে। জলে নামবার পর মনে হলো, এতক্ষণ আমি কি পাগলামি করছিলাম? সমুদ্র স্নান করার চেয়ে আর ভালো ব্যাপার কি থাকতে পারে?

তাছাড়া, বারান্দায় সর্বক্ষণ বসে থেকে আমি বোধহয় ক্ষতিই করছিলাম ওই বন্দী মেয়েটির। সবাই যখন স্নান করতে আসে, টুরিস্ট লজ ফাঁকা থাকে, তখন ও অন্তত নিশ্বাস ফেলার জন্য বাইরে আসতে পারে একবার।

সাহেবমেমরা জলের মধ্যে মাতামাতি শুরু করেছে। এরা হিপি-হিপিনি। এরা অনেকেই বিয়েটিয়ের ধার ধারে না। কত সাবলীল সুন্দরভাবে জীবন কাটাচ্ছে। ওদের পোশাক এতই ছোট এবং জলের মধ্যেই মাঝে মাঝে এমন চুমু খাচ্ছে যে মনে হয় যেন ইংরেজি সিনেমার দৃশ্য দেখছি।

আর আমাদের প্রতিবেশী ওই ছেলেটি একটি মেয়েকে পুরীতে নিয়ে এসেও একবারও সমুদ্রে স্নান করার সুযোগ দিতে পারছে না। কি এমন ভয়? মেয়েটিই বা রাজি হলো কেন?

টুরিস্ট লজে আরও দু দিনের মধ্যেও আমি মেয়েটিকে একবারও দেখতে পাই নি। অবশ্য বারান্দায় বসে পাহারা দেওয়াও বন্ধ করেছিলাম। এর মধ্যে একদিন কোনারক ঘুরে আসার জন্য সারাদিন কাটলো বাইরে।

এর মধ্যে শান্তাও বিশ্বাস করেছে মেয়েটির অস্তিত্ব। কোনো একসময় আমি যখন ছিলাম না, তখন শান্তা শুনতে পেয়েছিল, ঘরের মধ্যে মেয়েলি গলার কান্না। মেয়েটি কাঁদছিল যখন, তখন ঘরটাতে তালা বন্ধ ছিল না, অথচ ছেলেটিও ভেতরে।

শান্তা এই কথা বলার পর আমি একটু চিন্তা করেছিলাম। ছেলেটি যদি ঘরের মধ্যে একটি মেয়েকে বন্ধ করে রেখে নির্যাতন করে, তা হলে আমার উচিত এর একটা কিছু প্রতিকার করা। পুরুষমানুষ হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব।

কিন্তু ছেলেটিকে তো সে রকম অত্যাচারী বলে মনে হয় না! একটু যেন ভীতু ভীতু ভাব সব সময়ে। অবশ্য অনেক লোকই ঘরের মধ্যে আর ঘরের বাইরে এক রকম নয়।

ব্যাপারটা নিয়ে টুরিস্ট লজের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করার জন্য গেলাম অফিসঘরে, সন্ধের দিকে। ম্যানেজারের টেবিলের ওপর পা তুলে কাগজ পড়ছিলেন। এখানে কাগজ আসে দুপুরের দিকে। আমাকে দেখেই বললেন, কি কাগজ পড়বেন নাকি?

আমি বললাম, না, অন্য একটা কথা। মানে, আঠেরো নম্বর ঘরে যারা আছে।—

ম্যানেজার বললেন, আঠেরো নম্বর ঘরে? কেউ নেই তো! ও ঘর তো খালি।

আমি বললাম, না না, খালি না। আমাদের ঘরের থেকে কয়েকখানা ঘর পরেই—

—না, খালি ওই ঘর।

আমি বেশ জোরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, ম্যানেজার তার আগেই আবার বললেন, এই তো আধঘণ্টা আগেই খালি হয়ে গেল। মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস দত্ত ছিলেন—

আমি চমকে উঠলাম। আধঘণ্টা আগে খালি হয়ে গেছে! দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আঠেরো নম্বর ঘরের চাবি ঝুলছে। আর কিছু বলা যায় না। ওরা স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছিল এখানে। তারপর যদি একজন ঘর থেকে না

বেরোয় কিংবা চাপাগলায় কাঁদে, সে ব্যাপারে আমাদের নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই।

এর পর শান্তা যখন বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছে, আমি 'একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে পড়লাম। যেন একটা চুম্বক আমাকে টেনে নিয়ে গেল রেলস্টেশনে। আমি জানি, সারাদিনে একটি মাত্র ট্রেন চলছে, তাও রাত ন'টার আগে ছাড়বে না।

এ আমার কি অশুভ কৌতূহল! কেন আমি ওদের পেছনে পেছনে এ রকম গোয়েন্দাগিরি করছি! ওরা নিরিবিলিতে থাকতে চেয়েছিল, আমার উচিত ছিল না, ওদের কোনো রকম ব্যাঘাত না করা?

কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে একটা গল্প আছে। সাধারণ-ভাবে একটা ছেলে বা মেয়ে যদি বিয়ে না করেও স্বামী স্ত্রী সেজে পুরীতে ফুর্তি করতে আসে, তার মধ্যে কোনো গল্প নেই। কিন্তু এই গোপনীয়তা, ঘরের মধ্যে চাপাগলায় কান্না—এতেই তো রহস্য ঘনিয়ে উঠলো। সেই জন্যই এই গল্পের নায়িকার মুখটা অন্তত একবার দেখবার জন্য ছটফট করছিলাম।

রেলস্টেশনে বিরাট ভিড়। ট্রেন চলবে কিনা ঠিক নেই। তবু বেশ খানিকটা দূর থেকে আমি ওদের দেখতে পেলাম। একটা বেঞ্চিতে বসে আছে ছেলেটি, তার পাশে, কাঁধে মাথা রেখে একটি কালো শাড়িপরা মেয়ে। মেয়েটির মুখ দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

মেয়েটি আমার চেনা!

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, এত গোপনীয়তা আর গোপন কান্নার কারণ। আমাকে আর শান্তাকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই মেয়েটি আত্মগোপন করেছিল।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার মতন অবস্থা। আমার জন্যই ওদের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। আমি যেন একটি মূর্তিমান ব্যাঘাত। আমি নিজের এ রকম ভূমিকা কখনো কল্পনাও করি নি। ওরা তো জানে না যে আমি জানতে পারলেও ওদের সমর্থনই করতাম।

যাক, ওরা নিশ্চিন্ত যে আমি শেষ পর্যন্ত কিছু জানতে পারি নি। সেই জন্যই, মেয়েটি এখন নিশ্চিন্তে এত লোকজনের মধ্যেও ছেলেটির কাঁধে মাথা হেলান দিয়েছে।

আমি দ্রুত চলে এলাম রেলস্টেশন থেকে। আর কোনো রহস্য বা আকর্ষণ রইলো না, কাল থেকে আবার শুধুই সমুদ্র দেখতে হবে।

আমার ভাই

আমার নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের কথা আমি প্রায়ই ভাবি। তার নাম ছিল টোটো, ভালো নাম তিমিরকুমার, মাত্র ছ'বছর বয়সে সে শিয়ালদা স্টেশনে হারিয়ে যায়।

টোটোর ঠিক ছ'বছর বয়সের ছবিও আমার বাড়িতে নেই। তার ছ'মাস বয়েস থেকে সাড়ে চার বছর বয়েস পর্যন্ত অনেক ছবি আছে, তারপরের দেড় বছর কি কারণে তার ছবি তোলা হয় নি। খুব বাচ্চা বয়সে ছবি তোলার ধুম থাকে, একটু বড় হলে সেটা অনেকটা কমে যায়।

টোটো খুব দুরন্ত ছিল। সেবার আমরা সবাই দার্জিলিং থেকে ফিরছিলাম। দার্জিলিংএ সামলাবার জন্য হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। টোটো এই আছে, এই নেই। যখন তখন দৌড়ে বাইরে চলে যায়। পাহাড় থেকে যদি পড়ে যায়—এই ভয়ে টোটোকে আমরা এক মিনিট চোখের আড়াল করতাম না। বাড়ির ছোট ছেলে বলে সে ছিল সবার চোখের মণি। দার্জিলিংএ টোটোর কিছু হয় নি, কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে এসে সে হারিয়ে গেল। আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছিলাম, বাবা কাকারা মালপত্র নামাবার তদারক করছিলেন। টোটো দৌড়াদৌড়ি করছিল—হঠাৎ তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

টোটোকে যে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি। একটা জলজ্যান্ত ছেলে কি চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেতে পারে? সবাই মিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। খুব তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। দারুণ খোঁজাখুঁজি। আমার ধারণা ছিল, টোটো নিশ্চয়ই কোনো কিছুর আড়ালে লুকিয়ে আছে—আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে যাবার পর বলে উঠবে, টুকি। এই যে আমি।

কিন্তু টোটোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের থিয়োরি ছিল, নিশ্চয়ই তাকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে। টোটোকে ধরেই ছেলেধরা কোনো চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়েছে, তাই আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। এরপর অবশ্য

সারা ভারতবর্ষের পুলিশের কাছে টোটোর ছবি পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু টোটো নিরুদ্দেশই রয়ে গেল।

প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস আমরা ভাবতাম, টোটো আবার ফিরে আসবে। কোনো জায়গা থেকে কেউ তার সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু কিছুই হলো না।

তারপব কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেই থেকে আমাব হার্টের অসুখ। মা বছরের অধিকাংশ সময়ই বিছানায় শুয়ে থাকেন। বাবা আর কখনো টোটোর নাম উচ্চাবণ করেন না—কিন্তু বাবা যে এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলেন সেটা বোধহয় মনের মধ্যে শোকটা চেপে রাখার জন্যই। আমার জেঠামশাই মারা গেলেন গত বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুর আগে জেঠামশাইয়ের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, তিনি শুধু বললেন, টোটোকে আর দেখলাম না।

আমাদের বাড়ি কেউ এলেই টোটোব গল্প শোনে। টোটোর হাজার রকমের দুষ্টুমির গল্প। টোটো এখনো সেই ছ'বছরের শিশুই বয়ে গেছে আমাদের স্মৃতিতে। মা এখনো রাস্তায় কোনো বাচ্চা ছেলে দেখলে ব্যগ্র হয়ে তাকান।

আমি অবশ্য বুঝতে পারি টোটো বেঁচে থাকলে এখন তার বয়স ছাব্বিশ বছর। টোটো বেঁচে নেই একথা বিশ্বাস করতে পারি না। টোটোর অসম্ভব প্রাণশক্তি ছিল। আমি পথে ঘাটে ঘোরবার সময় ছ'বছরের শিশুদের বদলে ছাব্বিশ বছরের যুবকদের মুখে তীক্ষ্ণভাবে তাকাই। কোথাও অচেনা কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। এ টোটো নয়ত?

একদিন কলেজ স্ট্রীটের গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলাম। দারুণ বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি। পুলিশ এসে টিয়ার গ্যাস চার্জ করতেই আমি আর আমার বন্ধু সুবিমল দৌড়ে পালালাম। একটা বাড়ির দরজা ঠেলে ভিতরে দাঁড়িয়েছি, আমাদের ঠেলে একজন যুবক বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তাব দু'হাতে দুটো বোমা। আমার মাথা গুলিয়ে উঠল। দৌড়ে গিয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরে বললাম, এই, কি করছো কি? ছেলেটা রুক্ষভাবে বললো, ছাড়ুন।

—ওদিকে গেলে এখন মরবে। পুলিশ গুলি চালাচ্ছে।

ছেলেটি এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল। আমি আবার ফিরে এলাম।

সুবিমল বিবর্ণ মুখে আমাকে বললো, তোর কি মাথা খারাপ? তুই ওকে

আটকাতে গিয়েছিলি ? তোকেই যে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় নি, এই তোর ভাগ্য ভালো !

আমার চোখে জল এসে গেল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তুই জানিস না ও বোধ হয় আমাব ভাই।

সুবিমল অবাক হয়ে বললো, তোব ভাই, তার মানে ?

আমি আমার যে এক ভাই হাবিযে গেছে, তাব বয়েসও ঠিক এই রকম।

—চেহাবায় মিল আছে ?

আমি ম্লান হেসে বললাম, তার চেহারা এখন কি রকম আমি জানি না। তবু আমার মনে হলো, ও আমাব ভাই তো হতেও পাবে ? তবু আমরা আর পরস্পরকে চিনতে পারবো না !

সেই দ্বীপে

এক স্বপ্ন সাধারণত মানুষ দু'বার দেখে না। কিন্তু আমি প্রায়ই ঘুরে ফিরে একটা স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নটিতে আমি এখন এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে জেগে থেকেও দেখতে পাই অনেক সময়।

এটা একটা দ্বীপের স্বপ্ন। তাতে তিনটি মাত্র মানুষ। দুটি পুরুষ একটি নারী। কিংবা সহজ করে বলা যায়, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তিনজনেরই বয়েস একুশ বাইশের বেশী নয়। ছেলে দুটি এবং মেয়েটিও প্যান্ট শার্ট পরা, কিন্তু সেই পোশাক এখন প্রায় ছিন্নভিন্ন, দেখলে মনে হয়, ওরা কোনো নৌকো বা জাহাজ ডুবির ফলে কোনোক্রমে ওই দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছে। যদিও ওদের মুখে কোনো বিপদের চিহ্ন নেই।

দ্বীপটি ছোট। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সহজেই দেখা যায়। উপকূলের কাছটা পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো—সমুদ্রের ঢেউ এসে সেখানে ক্রমাগত আছড়ে পড়ে, সব সময় সাদা ফেনা।

কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে, গাছগুলোর নাম আমি জানি না। তবে তবে রেনট্রি কিংবা বাওবাব—এই ধরনের চিরল গাছও হতে পারে। দ্বীপের মাঝখানটায় ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল, অনেক বুনো ফুল ফুটে আছে—ফুল-গুলো সূর্যমুখী ফুলের ধরনের। দ্বীপটিতে বড় জন্তু-জানোয়ার কিছু নেই—আছে অসংখ্য ফড়িং—তাদের ডানার শব্দ ঢেউয়ের শব্দের মতনই অবিরাম। আর আছে বেশ কিছু খরগোশ। ওই ছেলেমেয়ে তিনটি প্রায় সব সময়ই ধূসর খরগোশগুলোকে তাড়া করছে। দেখে হঠাৎ মনে হয়, খরগোশের পেছনে বাচ্চা ছেলের মতন ছুটোছুটি করছি ওদের সারাদিনের খেলা। আসলে খেলা নয়। ওই খরগোশগুলোই ওদের খাদ্য। কোনোরকমে একটা দুটো খরগোশ ধরতে পারলেই ওরা সেগুলো আগুনে ঝলসে নিয়ে খেতে বসে যায়। একটা বড় পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালা আছে। সব সময়েই জ্বলছে—ওরা একজন এসে মাঝে মাঝেই এক একখানা কাঠ ফেলে দিয়ে যায় সেই আগুনে।

স্বপ্ন সব সময়েই সংক্ষিপ্ত। আমি এক একবার এক একটা ছোট দৃশ্য দেখি।

কখনো দেখি, ওরা তিনজনে ঘুমিয়ে আছে আগুনের পাশে। কখনো দেখি ওরা কয়েকটা পাথরের টুকরো দিয়ে কি যেন হিসেব-নিকেশ করছে। কখনো ওরা এক সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে নামে।

সারাদিন ধরে আমি এই টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলোকে জুড়ে নিই। একলা থাকলেই এই স্বপ্নটা আমাকে পেয়ে বসে। ওই দ্বীপবাসী ছেলেমেয়ে তিনটির জীবন আমারও জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। আমার মনে হয় সত্যিই কোনো দ্বীপে ওরা আছে।

মাঝে মাঝে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। কখনো ওই ছেলেমেয়ে তিনটি কারুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেলে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে বলে, এসো, এখানে চলে এসো।

আমি এর মানে বুঝতে পারি না। কি করে যাবো? আমি ওই দ্বীপটার কোনো সন্ধান জানি না। স্বপ্নের মধ্যেও যাওয়া সম্ভব নয়—কারণ, ইচ্ছে মতন স্বপ্ন দেখার কোনো ব্যবস্থা এ পৃথিবীতে একবারও হয় নি। এক সময় জোর করে চোখ বুজে পড়ে থাকি, যদি স্বপ্ন আমাকে ওই দ্বীপে নিয়ে যায়! কিন্তু নিয়ে যায় না।

সারাদিন চাকরি-বাকরি, হাট-বাজার, কত রকম মানুষজন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কখনো বিনা কারণে লোকে অপমান করে যায়, অনেক সময় সহ্য করতে হয় অনেক রকম মিথ্যে। মনের গ্লানি মনেই চাপা থাকে—ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখন ইচ্ছে হয়, সেই দ্বীপটায় চলে যেতে। আমাকে আরও দুঃখ দেবার জন্য তখন স্বপ্নের সেই তিন ছেলেমেয়ে হাতছানি দিয়ে বলে, এসো, এসো।—

ওদের দেশে ঈর্ষা বা লোভ নেই দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। অনেক সময় মেয়েটি একটি ছেলের সঙ্গে নাচে, আর একটি ছেলে হাততালি দিয়ে তাল দেয়। কখনো সে বনহরিণীর মত একা একা ছুটে বেড়ায়, ছেলে দুটি তাকে খোঁজে।

তারপর স্বপ্নের দেবী একদিন আমার ওপর সদয় হলেন। আমি সেই দ্বীপে উপস্থিত হলাম। ছেলেমেয়ে তিনটি আগুনের পাশে ঘুমোচ্ছে। আমি নিঃশব্দে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমনও হতে পারে, ওরা তিনজনে মিলে তখন আমাকেই স্বপ্ন দেখছে, ওদের স্বপ্নের মধ্যে আমি ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

ছেঁড়া ময়লা পোশাক, তবু ওদের শরীরে অপূর্ব রূপলাবণ্য। ঘুমন্ত মুখে লেগে আছে ক্ষীণ হাসি। ঘুমের মধ্যেও মেয়েটির দুই হাত ধরে আছে ছেলে দুটি। যেন ওরা তিনজনে মিলে একটি মানুষ শিকল।

একটু শব্দ করতেই ওরা জেগে উঠলো। অবাক হলো না। চোখ রগড়ে বললো, এই যে এসেছো, বসো।

মেয়েটি কয়েকটি পাথরের টুকরো বার করে বললো, প্রথমে আমরা খেলাটা করে নিই, তারপর অন্য কথা হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি খেলা ?

মেয়েটি বললো, পাথরের পাশা খেলা। তুমি যদি জিততে পারো, আমরা তোমার ক্রীতদাস হবো। আর যদি হেরে যাও, তাহলে তুমি হবে আমার ক্রীতদাস। এই ছেলে দুটি যেমন আমার দাস হয়ে আছে।

আমি বললুম, এরকম অদ্ভুত নিয়ম কেন ?

মেয়েটি বললো, পৃথিবীর সব জায়গাতেই তো এই রকম নিয়ম। সব জায়গাতেই তো কেউ না কেউ প্রভুত্ব করে, তাই না ?

আমি বললুম, যেখানে টাকাপয়সা বা বিষয়সম্পত্তির প্রশ্নই নেই, সেখানে-তো এ নিয়ম থাকতে পারে না।

মেয়েটি বললো, আমরা দেখেছি, একজন আর একজনের ওপর প্রভুত্ব না করে বাঁচতে পারে না। তাই আমরা খেলার এই নিয়ম করেছি।

—কিন্তু দূর থেকে তোমাদের দেখে তো এরকম মনে হয় নি।

—দূর থেকে দেখা আর কাছ থেকে দেখা তো এক নয়।

মেয়েটি খেলার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। এই চ্যালেঞ্জ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভয়ে আমার বুক দুপদুপ করছে। যদি হেরে যাই, তাহলে সারাজীবন এই দ্বীপে এই মেয়েটির ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে ? কিন্তু আমার যে অনেক পিছুটান।

তবু, আমি খেলার নিয়ম জেনে নিয়ে, পাথরের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিলাম। ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারি নি।

মেয়েটি বললো, তুমিই জিতেছো।

ছেলে দুটি বললো, আমরা সবাই তোমার ক্রীতদাস।

আমার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। আমি মহৎ উদার ভঙ্গিতে বললাম, আমি তোমাদের মুক্তি দিলাম। তোমরা তিনজনেই এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আসলে, এ জীবনে আমি অনেকের কাছেই ক্রীতদাস। শুধু একবার ওই তিনটি যুবক যুবতীকে মুক্তি দিতে পেরে আমার যা আনন্দ হয়েছিল, সে রকম আনন্দ আর কখনো পাই নি।

একটি পুরনো বই

ছেলেটি অনেকক্ষণ বসেছিল এক কোণে। ঘর-ভর্তি লোক। দিবানাথ চৌধুরী এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন, এখন বড় ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত সমাজসেবক। সুতরাং বহু লোক আসে তাঁর কাছে। কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানায়, অনেকেই নানারকম চাকরি-বাকরি বা অনুগ্রহ চায়, কেউ কেউ শুধু একবার করে দেখা দিয়ে পুরনো পরিচয় ঝালিয়ে রাখে—কখন কি দরকার পড়বে তার তো ঠিক নেই।

কলকাতায় যে-কদিন থাকেন, দিবানাথ সকালের কয়েক ঘণ্টা এই সব লোকের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন। তাঁর অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব—তবু এদিকটাও উপেক্ষা করা যায় না, জনসংযোগ রক্ষা করাও তো দরকার।

দিবানাথের বসবার ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি পাতা, হঠাৎ দেখলে কোনো বড় ডাক্তারের চেম্বার বলে মনে হয়। এর পাশেও একটি ছোট ঘর আছে, সেখানে দিবানাথের সেক্রেটারি বসেন। সেক্রেটারিই দর্শনার্থীদের নাম ধাম লিখে ভিতরে পাঠান।

দিবানাথ এক এক করে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন—এক সঙ্গে অনেকের সঙ্গে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়, ঠিক ডাক্তারদেরই মতন। তবে, কারুর সঙ্গে একটু বেশীক্ষণ কথা বললেই বক্তৃতার মতন শোনায়—কলেজে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই এই অভ্যাসটা হয়ে গেছে।

এত লোকজনের ভিড়ে দিবানাথ ছেলেটিকে লক্ষ্যই করেন নি।

দিবানাথের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, বেশ রাশভারি চেহারা, মুখ দেখে মনে হয়, পৃথিবীর ওপর তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগই নেই। তবে, অন্যান্যদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

চাকরির আবেদন প্রার্থীই বেশী। এদের সঙ্গে একঘেয়েভাবেই কথা বলতে হয়। সবার আবেদনপত্রের ওপর তো তিনি আর সুপারিশ করে দিতে পারেন না। সেটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। তিনি সবাইকে বোঝাতে চান যে, সবাইকেই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে শিল্প বাণিজ্য স্থাপনের

চেষ্টা তো চলছেই। কিন্তু বাঙালী যদি শুধু চাকরি লোভী হয়েই থাকে—ইত্যাদি।

কেউ কেউ আসে হাসপাতালের সীট কিংবা সরকারী ফ্ল্যাট যোগাড় করার চেষ্টায়। কারুর কারুর গোপন কথাও থাকে।

ছেলেটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তাকে কেউ ডাকে নি, সামনে যেতেও বলে নি। এক সময় সে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে দিবানাথের সামনে এগিয়ে বললো, স্যার—।

দিবানাথ মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেটির রোগা দোহারা চেহারা, এক মাথা অবিন্যস্ত চুল, আধ ময়লা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে আছে—বয়স একুশ-বাইশের বেশী না।

দিবানাথ তখন আর একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, হাত তুলে বললেন, একটু পরে। একে একে আসবে।

ছেলেটি বললো, স্যার, আমি কিছু চাইতে আসি নি। আপনাকে একটি জিনিস দিতে এসেছি।

—কি, দরখাস্ত ?

—না, একটা বই।

দিবানাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন, অনেকেই তাঁকে বই-টই উপহার দেয় বটে। এককালে তাঁর বই পড়ার খুবই নেশা ছিল, কিন্তু সে নেশা অনেকদিন ঘুচে গেছে। এখন সময় কোথায় ? সব সময়ই তো লোকজন ঘিরে থাকে। গত এক বছরের মধ্যে সরকারী রিপোর্ট আর খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বই উল্টে দেখেছেন কিনা ঠিক নেই।

ছেলেটির হাতে একটি ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট ছিল—সেটি খুলে একটি বই দিবানাথের টেবিলের ওপর রাখলো। খুব বিনীতভাবে বললো, একবার উল্টে দেখবেন, আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। বইখানা বহুদিনের পুরনো। অতি সাধারণ চেহারা, মলাট পর্যন্ত ছেঁড়া। একজন এত বড় বিখ্যাত ব্যক্তিকে আর কেউ কোনো দিন এরকম একটি পুরনো অকিঞ্চিৎকর বই উপহার দেয় নি।

দিবানাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ?

ছেলেটি বললো, কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানে পেলাম।

একবার চোখ না বুলিয়ে পারা যায় না। নিয়ম রক্ষার জন্য দিবানাথ একবার

বইয়ের পাতা ওল্টালেন। একটি ইংরেজি কবিতার সংকলন, পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' এই বই হঠাৎ তাঁকে দেবার মানে কি ?

পরের পাতা উল্টে দেখলেন অতি অস্পষ্ট কালিতে লেখা আছে, 'তোমাকে দিলাম'—দিবানাথ চৌধুরী।

দিবানাথ এক দৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইলেন। হাতের লেখাটা তাঁর নিজেরই মনে হচ্ছে। অবশ্য, বহুদিন তার বাংলায় কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। তবু চেনা যায়। কিন্তু সেটা দেখে দিবানাথের কিছু মনে পড়ে না।

আর একটি পাতা উল্টে দেখলেন গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতে লেখা আছে, 'শ্রীমতী আশা বন্দ্যোপাধ্যায়, দোল পূর্ণিমা'।

দিবানাথের ষাট বছরের বুকটা ধক্ করে উঠলো। একি! এটা তো সত্যিই তিনি একদিন একজনকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

—তুমি এ বই কোথায় পেলে ?

কেউ উত্তর দিল না। দিবানাথ চোখ তুলে দেখলেন, ছেলেটি নেই।

ঘরের অন্য লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেল ছেলেটি ?

—দেখলুম তো স্যার, বেরিয়ে গেল।

—আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল ? রতন, রতন !

পাশের ঘর থেকে দিবানাথের সেক্রেটারি হন্তদন্তভাবে ছুটে এলো। দিবনাথ বললেন, একটি ছেলে এখানে ছিল এই মাত্র, রোগা মতন, সে কোথায় গেল দেখ তো !

রতন জিজ্ঞেস করলো, কি নাম, স্যর ?

—নাম তো বলে নি। পাঞ্জাবি পরা, বড় চুল—

সেক্রেটারি ছুটে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'তিনজন। একটু বাদেই ফিরে এসে বললো, নেই তো। চলে গেছে। পুলিশে খবর দেবো ?

দিবানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, তার দরকার নেই।

আর কারুর সঙ্গে কথা না বলে দিবানাথ বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এক সময় এইসব কবিতা মুখস্থ ছিল তাঁর। আশাকে এর থেকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। অতি কষ্টে দু পয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে এই বইটা কিনে উপহার দিয়েছিলেন আশাকে। তখন বইটার দাম ছিল মাত্র দু' টাকা। বইটা পেয়ে আশা খুব খুশী হয়েছিল—দিবানাথ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আশার হাস্যোজ্জ্বল মুখ—এই চল্লিশ বছর পরেও।

তখন বৃটিশ আমল, দেশ জুড়ে অত্যাচার চলছে, চাকরি-বাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। সহায় সম্বলহীন দিবানাথ এই কলকাতায় কতদিন কলের জল খেয়ে কাটিয়েছেন। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন কত লোকের কাছে। কেউ পাত্তা দেয় নি। সামান্য একটি টিউশনিই ছিল সম্বল। সেই সূত্রেই আশার সঙ্গে আলাপ। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আশাকে। কিন্তু আশার মা-বাবা জানতে পেরে দিবানাথকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনায় ভালো ছিলেন দিবানাথ তবু পাত্র হিসেব তাঁকে পছন্দ করেন নি তাঁরা। আশার বিয়ে দিয়েছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। আজ ওরকম কত ইঞ্জিনিয়ার দিবানাথের কাছে হাত জোড় করে বসে থাকে। দিবানাথের বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগলো। আশা কোথায় আছে এখন। বেঁচে আছে কিনা তাও তিনি জানেন না।

কিন্তু এতকাল পরে তাঁর এই দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কি? ছেলেটি কে? কেন এসেছিলো? এমনও হতে পারে—ছেলেটি হয়তো আগে দু' একবার এসেছিল, চাকরি বা কোনো সাহায্য চেয়েছিল, পায় নি, তাই এমন ভাবে প্রতিশোধ নিয়ে গেল? একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মনে আঘাত দেবার সুখও তো কম নয়।

কিংবা দিবানাথের আর একটা কথাও মনে হলো। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন, চল্লিশ বছর আগে তাঁর নিজের চেহারাও ওই ছেলেটিরই মতন ছিল। ওই রকম রোগা, এক মাথা চুল, জামা ময়লা। ওই ছেলেটা কি তাঁরই বিবেক? একটা ছেলের ছদ্মবেশ ধরে তাঁর বিবেক এসেছিল তাঁকে সচেতন করে দিতে?

দিবানাথ আপন মনে একটু হাসলেন। তাঁর যে বিবেক আছে বা কোনোদিন ছিল—এ কথাটাই যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন অনেক দিন।

যা চলছে

হর্তেল গাঁয়ের পোস্টমাস্টারের সাত মেয়ে। তার মধ্যে তৃতীয় মেয়েটির বয়স সতেরো কি আঠারো, কিন্তু দেখায় যেন পঁচিশ। এর মধ্যেই দুশ্চরিত্রা হিসেবে তার বেশ নাম ছড়িয়েছে। প্রত্যেক হাটবার এক দোকান থেকে আর এক দোকানে চালাচালি হয়ে যায় পোস্টমাস্টারের তৃতীয় মেয়ে শুষির নতুন নতুন গল্প।

নদীর ধারে কবে একা স্নান করছিল শুষি। একা একাই সে স্নান করতে যায়। কে একজন নৌকোর মাঝি বুঝি তাকিয়েছিল তার দিকে। শুষি নাকি শঙ্খচড় সাপের মতন শিস দিতে পারে। সেই শিসের ডাক শুনলে ফিরে যাওয়ার সাধ্য কারুর নেই। জোয়ান মাঝিটা নৌকো ভেড়ালো পারে, শুষি সেই নৌকোয় উঠে বসলো। নৌকো আবার দু'জনকে নিয়ে ভেসে গেল নদীতে।

তামাক পাতার দোকানে বসে গুলতানি করতে করতে হারাধন সাপুই বললো, এতো আমার স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা। কি বলো গো ইছাইদা?

ইছাইদা ঘাড় নাড়ে। আজ পর্যন্ত সে কারুর কোনো কথায় প্রতিবাদ করে নি।

হারাধন আবার বললো, একদিন বদন শেখ এক চাক নতুন পাটালি দিয়েছিল ওই সোমত্থ মেয়েটাকে। এও আমার স্বচক্ষে দেখা।

ইছাইদা আবার ঘাড় নাড়লো।

হারাধনের পাশে বসে ছিল বগলাচরণ। গোগ্রাসে গিলছিল এইসব গল্প। তামাকের দোকানের সভা ভঙ্গ হলে সে গেল আলু পেঁয়াজের দোকানে। প্রত্যেক হাটেই বগলাচরণের মতন কয়েকটি লোক থাকে, যাদের কোনো কাজ থাকে না, কোনো কেনাকাটি থাকে না, শুধু এখানে ওখানে বসে সময় কাটায়। আলু পেঁয়াজের দোকানেও গল্পের অভাব নেই। সেখানে ট্যারা কালু দাবি করলো, সেও স্বচক্ষে দেখেছে যে শুষির বুকে দুধ আছে। শুষি নাকি ভর সন্ধেবেলা বুকের আঁচল সরিয়ে নন্থ পিসীর কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। অবিবাহিত মেয়ের বুকে দুধ থাকে কেমন করে হে? এই কথা বলে ট্যারা কালু এমন হাসতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত তার হেঁচকি উঠে যায়।

হাট থেকে ফেরার পথে বগলাচরণ তার তিনজন সঙ্গীর কাছে এই সমস্ত গল্প উগরে দেয়। সেই সঙ্গে জুড়ে দেয় তার নিজের মন্তব্য, ও মেয়ে, বুঝলি না দাদা, পুরুষমানুষ দেখলেই বুকের রক্ত শুষে নেয়। এমনি এমনি কি আর ভগমান শুষি নাম রেখেছে!

শুষির আসল নাম যে সুশীলা সে কথা কেউ মনে রাখে নি। অনেকে জানেই নি

বেড়াচাঁপার মোড়ে এসে বগলাচরণের দু'জন সঙ্গী চলে যায় আকন্দপুর আর বাসুলিডাঙার দিকে। তারাও সেখানে গিয়ে তাদের গল্পের শ্রোতা পেয়ে যায়। এইভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নাম ছড়িয়ে পড়ে শুষির।

শুষির গল্প বছর খানেক ধরে বেশ স্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য হবার পর তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে ওঠে শ্রীপতি রায়। তখন হাটুরে লোকের গল্পে আবার একটা নতুন স্বাদ আসে।

শ্রীপতি রায় মান্যগণ্য লোক। প্রায় দুশো বিঘের চাষ আছে, তাছাড়া তিন-খানা পুকুর, একটা পানের বরজ। বাড়িতে দু'বেলা পনেরো বিশজন লোকের পাত পড়ে। মানুষটা খুব হিসেবী, খরা-অজন্মার বছরেও কেউ শ্রীপতি রায়কে ঠকে পড়তে দেখে নি! বালা কিংবা তাগা বন্ধক রাখার জন্য যে-যখন শ্রীপতি রায়ের কাছে গেছে, অমনি টাকা পেয়েছে।

শ্রীপতি রায় বেঁটেখাটো লোক, বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও শরীরে শক্তি আছে। গরুর গাড়ির চাকা কাদায় আটকা পড়লে সে এখনো কাঁধ লাগিয়ে ঠেলে তুলতে পারে। গাছ কাটার সময় সে এখনো নিজেই কুড়ুল চালায় এবং সরকারী বাবুদের সঙ্গে সে গুছিয়ে পাঁচকথা বলতে পারে।

শ্রীপতি রায় মোট বিয়ে করেছে আটবার। এর মধ্যে দু'জন গত হলেও বাকি ছ'জনকে নিয়ে তার এক সংসার। কোনোদিন তার বাড়িতে কেউ ঝগড়া-ঝাঁটি দেখে নি। কোনো বউ কখনো একটু ট্যাঁ ফোঁ করলেই তার জন্য শ্রীপতি রায়ের একটি মোক্ষম ওষুধ আছে। কেউ একটু মুখ ঝামটা দিলেই খাওয়া বন্ধ। তিনদিন ভাত বন্ধ রাখলেই সব মেয়ে ঠাণ্ডা। আর ঠিক ঠিক কাজকর্ম করলেই যত ইচ্ছে পেট ভরে ভাত খাও, সে ব্যাপারে শ্রীপতি রায়ের কোনো কার্পণ্য নেই।

প্রথম বউটি বাঁজা বলেই শ্রীপতিকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়েছিল। তার পরেও বিয়েগুলির মধ্যে রীতিমতন হিসেব এবং শৃঙ্খলা আছে। রাজা বাদশাহের মতন নিছক লোভ-রিপুর তাড়নায় শ্রীপতি রায় কক্ষনো বিয়ে করে না।

পানের বরজে পুরুষমানুষের বদলে মেয়েমানুষ দিয়ে কাজ করলে ফলন ভালো হয়। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ঢুকতে হয় পানের বরজে। একটু অযত্ন করলে মিঠে পান ঝাল হয়ে যাবে। তাই পুরুষজনের বদলে দুটি মেয়েকে রাখা হয়েছিল পানের বরজে। দু'টাকা করে রোজ দিতে হয় আর একবেলা পেট-চুক্তি ভাত। সেবার বেশী বর্ষার ফলে পানের দাম পড়ে গেল, বছর শেষে হিসেব কষতে বসলো শ্রীপতি রায়। ঠিক পড়তা পোষাচ্ছে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি এসে গেল। পানের বরজের মেয়ে দুটিকে বিয়ে করে ফেললেই খরচা অনেক কমে যায়। বিয়ে করলে দু'বেলা ভাত দিলেই যথেষ্ট, নগদ টাকা দেবার কোনো প্রশ্ন নেই।

দুটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে রাজি হয় নি। সে ছাঁটাই হয়ে গেল। তার বদলে অন্য মেয়ে পেতে দেরি হলো না। পুরুত এসে মন্ত্র পড়ে এক সঙ্গে দুটি মেয়ের বিয়ে সাঙ্গ করলো শ্রীপতি রায়ের সঙ্গে।

এই ব্যাপারে একটা নতুনা পথ খুলে গেল শ্রীপতি রায়ের সামনে। তার বাড়িতে তিনটি গরু। গরু চরানো ও দুধ দোওয়ানোর জন্য একজন রাখাল রাখতে হয়। একদিন ধরা পড়লো, রাখাল ছোঁড়া রোজই খানিকটা করে দুধ চুরি করে। শ্রীপতি রায় বেদম খড়ম পেটা করলো ছোঁড়াটাকে। তারপর চিন্তা করতে বসলো। গরুগুলোর দেখাশুনো করার জন্য পুরুষের বদলে একজন মেয়ে মানুষ রাখলেও চলে। আর সেই মেয়েমানুষটি যদি এ বাড়িতেই থাকে তাহলে সে আর চুরি করে কোনো জিনিস বাইরে সরাতে পারবে না। সুতরাং শ্রীপতি রায়কে আর একটি বিয়ে করতে হলো।

এইভাবে শ্রীপতি রায়ের প্রত্যেকটি বিয়েই প্রয়োজন ভিত্তিক। প্রত্যেক স্ত্রীর ওপরেই আলাদা আলাদা কাজের ভার দেওয়া আছে। কারুর সঙ্গে কারুর ঝগড়ার সুযোগ নেই।

বাসুলিডাঙার আর সব মানুষ শ্রীপতি রায়ের সুখ ও সমৃদ্ধি দেখে হিংসে করে। লোকটার কোনোদিকে কোনো খুঁত নেই। এতগুলো বউ নিয়েও লোকটা হিমসিম খায় নি।

এ গ্রামে কোনোদিন মোটরগাড়ি বা লরি ঢোকে নি, কারণ পাকা রাস্তা অন্তত এগারো মাইল দূরে। গরুর গাড়ি চলার একটা কাঁচা রাস্তা আছে বটে কিন্তু বর্ষার সময় কোনো রাস্তাই থাকে না। সবচেয়ে কাছাকাছি থানাও অন্তত দশ মাইল দূরে, আর ইলেকট্রিকের আলো দেখতে হলে যেতে হবে গোসাবায়।

খবরের কাগজ কেউ কখনো চোখে দেখে নি। দুটি ট্রানজিস্টার রেডিও আছে বটে দু'বাড়িতে, তাতে খবর শুনে এই কয়েকটা গাঁয়ের লোক জানতে পারে যে এইসব গাঁয়ের বাইরেও একটা দেশ আছে। কিন্তু সেই দেশ তাদের মনে রাখে নি।

বিকেলবেলা শ্রীপতি রায় প্রতিদিন তার জমির চৌহদ্দি একবার ঘুরে দেখে আসে। কোন্ নারকোল গাছে কটা নারকোল ফলেছে, তাও তার মুখস্থ। ঝিঙে ক্ষেতে পোকা লেগেছে কিনা নিজে সে পরীক্ষা করে দেখে। তখন আকাশ ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে, মেঘলা মেঘলা আলোয় গাছপালা ঝিম হয়ে থাকে, কোথাও সাপে ব্যাঙ ধরার কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। বুক ভরে অনেকখানি নিশ্বাস নিয়ে হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায় শ্রীপতি রায়ের। পরপর এরকম কয়েকদিন মন খারাপ থাকলেই বুঝতে পারা যায় আবার তাকে একটা বিয়ে করতে হবে।

মাঝে মাঝে কখনো পুলিশের দারোগা বা বি ডি ও বাবু আসে এ গ্রামে বাড়িতে। আর কোথাও থাকার জায়গা নেই বলে শ্রীপতি রায়ের বাড়িতেই ওঠে। কতরকম বায়নাক্কা তাদের। যা হুকুম করবে তাই দিতে হবে। শুধু শুধু একটা খরচের ধাক্কা। গত দু'তিন মাস ধরে যেন সরকারী বাবুরা একটু ঘন ঘন আসছে, বোধহয় গাঁয়ের দুধ-পাটালির স্বাদ পেয়ে গেছে। এ ব্যাপারেও শ্রীপতি রায় একটু বিচলিত আছে।

একদিন হাট করতে গিয়ে শ্রীপতি রায় শুষির নানারকম কাহিনী শুনলো। মেয়েটা এখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সন্ধে হলেই বাঁধের পাশে তাকে নিত্য নতুন পুরুষমানুষের সঙ্গে দেখা যাবে। সব শুনে, সব দিক বিচার করে শ্রীপতি রায় একেই বিয়ে করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো।

শ্রীপতি রায় এর আগে যে কটি বিয়ে করেছে, সব কটিই গরিব ঘর থেকে ভালো স্বভাবের মেয়ে বেছে এনেছে। তার কোন বউয়ের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে কেউ কোনো দোষ দিতে পারবে না। এবার বুঝি তার একটু মুখ বদলাবার শখ হয়েছে।

শুষির বাবা হিতেন পোস্টমাস্টার একেবারে গরিবের হদ্দ। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে তার সংসারটা একটা শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন। হিতেন আবার নেশাভাঙ করে। তার বড় মেয়েটি বিয়ের পরই বিধবা হয়েছে। পরের মেয়েটির বিয়ে দিয়েছে এক বিহারী মাছের পাইকারের সঙ্গে। বাকি মেয়েগুলোর বিয়ে

দেওয়ারও সামর্থ্য তার নেই। তার বউ চিররুগ্না। সে নিজেও ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।

শ্রীপতি রায়ের প্রস্তাব পেয়ে হিতেন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। তার এক পয়সাও খরচ হবে না। শ্রীপতি রায়ই সব ব্যবস্থা করবে—সুতরাং এতে যদি একটা মেয়ের গতি হয়ে যায়, তার চেয়ে বড় কথা আর কি? শ্রীপতি রায়ের আরও বউ আছে। থাকুক না। সব কটা বউই তো খেতে পায়। সে সামর্থ্য যখন আছে শ্রীপতি রায়ের, তখন সে আরও বিয়ে করবে না কেন?

কিন্তু শুষি রাজি হলো না। সে ওই সাত সতীনের ঘরে যাবে না। কিছুতেই যাবে না। শ্রীপতি রায় বার বার লোক পাঠাতে লাগলো। বার বারই সে লোক দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু শ্রীপতি যা একবার ধরে, তা কিছুতেই ছাড়ে না। ওইটুকু একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবার পাত্র সে নয়!

পর পর ক'দিন শ্রীপতি রায় নিজে সন্ধেবেলা গিয়ে বাঁধের কাছে গিয়ে বসে রইলো। প্রত্যেকদিনই দূর থেকে দেখলো শুষিকে। লোকে যা বলে তা মিথ্যে কথা নয়, রোজই তার সঙ্গে নতুন নতুন লোক থাকে! দেখে বেশ সন্তুষ্ট হলো শ্রীপতি রায়। মেয়েটি বেশ, গড়ন-পেটন ভালো, চালচলন মোটেই গাইয়াদের মতন নয়—এই মেয়েকেই তার চাই।

বাঁধটা অনেকটা উঁচু। তার ঢালু পাড় ঘেঁষে কেউ নিচের দিকে নেমে গেলে, সন্ধের সময় ওপর থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ওইটাই শুষির লীলা-খেলার জায়গা।

একদিন শ্রীপতি রায় মনস্থির করে অপেক্ষা করে রইলো। এক সময় বাঁধের তলা থেকে শুষি একটা ছোকরার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ওপরে উঠে এলো। এইসব ব্যাপারের পর ছেলেমেয়ে আর এক সঙ্গে থাকে না। ছোকরাটা এক দিকে গেল, শুষি আর এক দিকে।

শ্রীপতি রায় শুষির পথ আটকে গলা খাঁকারি দিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েটা। শ্রীপতি রায়কে সে ঠিকই চিনেছে।

শ্রীপতি রায় ভালো করে দেখলো শুষির সর্বাঙ্গ। হাটে গরু-ছাগল কেনার সময় শ্রীপতি রায়ের নজর এরকম তীক্ষ্ণ হয়। মেয়েটির স্বাস্থ্যটি বেশ ভালই। বুকে আর পাছায় প্রচুর মাংস আছে। সরু কোমরটি দেখলে বোঝা যায় কাজকর্মে বেশ চটপটে। পায়ে হাজা নেই, হাতের চামড়া নরম। বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

বাড়ির বাইরে কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস নেই শ্রীপতি রায়ের। সেই জন্যই সে কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি আসল কথায় এসে গেল।

—তুমি এ বিয়েতে আপত্তি করছো কেন মা?

শুষি কোনো উত্তর না দিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘাড়টা বেঁকানো, পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

—আমার অন্য বউদের যা দিই নি, তোমাকে তাও দেবো। বছরে চারখানা শাড়ি।

শুষি চুপ।

—তোমার নিজের আলাদা ঘর থাকবে। মেঝেতে শুতে হবে না, খাটে শোবে।

শুষি তবু চুপ।

—তোমার যদি ব্যভিচার করতে ভালো লাগে সে সুযোগও পাবে।

এবার শুষি চমকে তাকালো শ্রীপতি রায়ের চোখের দিকে। সেই চোখ যেন বাঘের মতন চকচকে। কিংবা দৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো সাপ। সেই সম্মোহন অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই শুষির।

পরের সপ্তাহেই শুষির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শ্রীপতি রায়ের। বিয়ের রাত্রে সে শুষিকে স্পর্শও করলো না। তার ঘরে ছ'ছটি সতী-সাধ্বী বউ থাকতে এই কলঙ্কমাখা মেয়েকে সে ছুঁতে যাবে কোন দুঃখে।

জন-মজুরের ভাত রান্না করার মতন একটা হাল্কা কাজ দেওয়া হলো শুষিকে। তাদের সঙ্গে সে যত ইচ্ছে ঢলাঢলি করুক। কিন্তু বাড়ির বাইরে কক্ষনো যেতে পারবে না। বি ডি ও বাবুটি ঘন ঘন গ্রাম বেড়াতে আসে আজকাল। তাকে গাছের ফল, পুকুরের মাছ, ঘরের গাইয়ের দুধ খাইয়েও খুশী করা যায় না। রাত্তিরবেলা মেয়েছেলের জন্য আবদার করে। গত মাসে পীরগঞ্জ থেকে এইজন্য একটি নটী আনতে হয়েছিল শ্রীপতি রায়কে। মোটমাট বেয়াল্লিশ টাকা খরচা পড়েছে। প্রত্যেক মাসে সরকারী বাবুদের আবদার মেটাতে যদি এ রকম খরচ করতে হয় তাহলে তো সে ফতুর হয়ে যাবে।

তার চেয়ে নিজের বাড়িতেই ওরকম একটা মেয়েকে পুষে রাখা ভালো। অনেক সস্তা পড়ে।

অপয়া

কতকগুলো ব্যাপার আছে, যেগুলোর কথা আমরা খবরের কাগজে পড়ি কিংবা লোকের মুখে শুনি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হয় না। যেমন জীবনে আমি বেশ কয়েকবার প্লেনে চেপেছি, ট্রেনে চেপেছি অন্তত কয়েক শো বার, কিন্তু কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। তেমনি কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা কিংবা ডাকাতিও দেখার সৌভাগ্য হয় নি। সাধারণ মানুষের জীবন শুধু অতি সাধারণ ঘটনাতেই সাজানো থাকে। আবার এক একজন মানুষ থাকে, যাদের জীবনে এ রকম অনেকগুলো ঘটনাই পর পর ঘটে যায়। যাদের কাছে মৃত্যু অনেকবার কাছাকাছি এসে ফিরে যায়। তাদের জীবন নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক আলাদা।

সেই রকম একজনকে আমি দেখেছিলাম। বাণীদি। বাণীদিকে চিনতাম অনেকদিন ধরেই, কিন্তু যেদিন থেকে তাঁর জীবন কাহিনী জানতে পারলাম, সেদিন থেকে ওঁকে অন্য চোখে দেখতে লাগলাম। বাণীদি খুব একটা সুন্দরী না হলেও বেশ আকর্ষণীয় চেহারা। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় লম্বা, চোখে মুখে ব্যক্তিত্ব আছে এবং রীতিমত বিদুষী। দর্শনশাস্ত্রের ওপর বাণীদির লেখা দু'খানি বই আছে। আমি ইচ্ছে করেই ওঁর পুরো নাম জানাচ্ছি না। কী যেন এক অদৃশ্য অভিশাপের জন্য বাণীদি কখনো জীবনে সুখ পেলেন না।

গোড়া থেকে বলি। একবার আমরা দলবল মিলে ডায়মণ্ড হারবারে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। তখন বাণীদির বয়স বছর তিরিশেক, আমাদের আরও কম। সবাই মিলে শিয়ালদা স্টেশনে এসেছি সকালবেলা। স্টেশনে রীতিমত গোলমাল, কোন ট্রেন আগে যাবে, কোন ট্রেন পরে যাবে তার ঠিক নেই। আমরা রীতিমতন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

কি কারণে যেন বাণীদি এই পিকনিকের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। কিছুতেই আসতে রাজী হন নি। অনেকটা ওঁকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল। ট্রেনের গোলমাল দেখে বাণীদি বললেন, আমি তাহলে ফিরে যাই!

কিন্তু এতদূর এসে কি কেউ ফিরে যায়? আমরা বাণীদিকে জোর করে আটকে রাখলাম।

পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মে দুটি ট্রেন দাঁড়িয়ে। কোনটা আগে ছাড়বে কেউ বলতে পারে না। মোটামুটি আন্দাজ করে একটা ট্রেনে উঠে বসলাম। একটু পরেই সুবিমল খবর নিয়ে এল, আমরা ভুল ট্রেনে উঠেছি। অন্যটাই আগে ছাড়বে।

তক্ষুণি আমরা হুড়োহুড়ি করে, লটবহর নামিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে বসলাম অন্য ট্রেনটিতে। বাণীদি যাতে চলে না যান, সেই জন্য আমি ওঁর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা এই ট্রেনে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ট্রেনটা হুইশ্‌ল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। তখন আর আমাদের নামবার উপায় নেই। সকলে মিলে খুব একচোট গালাগাল দিলাম সুবিমলকে। সুবিমল মিনমিন করতে লাগলো।

যাই হোক আধ ঘণ্টা বাদে আমাদের ট্রেনটাও ছাড়লো। আমরা সবাই মিলে গান ধরলাম। আমাদের মধ্যে সুবিমল, মালতী আর অঞ্জনার গানের গলা বেশ ভালো। বাণীদিও এক একবার আমাদের সঙ্গে গলা মেলালেন। এখন বাণীদিকে বেশ হাসিখুশিই মনে হচ্ছে।

আমরা মাঝামাঝি পথ পৌঁছবার পর হঠাৎ মাঠের মাঝখানে থেমে গেল ট্রেনটা। ঘন ঘন হুইশ্‌ল বাজাতে লাগলো। কি রকম যেন আর্ত চিৎকারের মতন। অনেক কৌতূহলী যাত্রী নেমে পড়লো ট্রেন থেকে। সুবিমলই খবর নিয়ে এলো যে তিন মাইল দূরে একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমাদের এই ট্রেন আর চলবে কিনা সন্দেহ আছে।

তখন আমাদের অল্প বয়েস। কোনো ঘটনাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। ট্রেন চলবে না শুনেও খুব একটা ঘাবড়ে গেলুম না। আমি অন্যদের কাছে প্রস্তাব দিলাম, 'চল না আমরা হেঁটে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টটা দেখে আসি।'

সকলেই রাজি হলো। শুধু দেখলাম বাণীদি জানালার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মুখখানা দারুণ বিষণ্ণ। মনে হলো যেন অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে মনে খুব আঘাত পেয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বাণীদি আপনি যাবেন না?'

বাণীদি একটু ম্লান অপলকভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই জন্যেই আমি আসতে চাই নি। তোমরা কেন আমাকে নিয়ে এলে? আমার জন্যই তোমাদের সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'আপনার জন্য? আপনি আবার কি করলেন?'

বাণীদি—'তোমাদের পিকনিকে যাওয়া হলো না আর।'

—'তাতে কি হয়েছে? জিনিসপত্র তো সঙ্গেই আছে, আমরা না হয় এই মাঠের মধ্যেই পিকনিক করবো।'

বাণীদি তবু একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ সুবিমলের জন্যই তোমরা বেঁচে গেলে। শেষ মুহূর্তে সুবিমলের কথায় আমরা ট্রেন বদলালাম। নইলে আগের যে ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে, আমরা তো সেটাতেই থাকতাম।'

এ কথাটা অবশ্য প্রথমেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল। সত্যিই, একটুর জন্য আমরা আগের ট্রেনটায় যাই নি।

সুবিমল বললো, 'আমি তখনই বুঝেছিলাম। আমি বিপদের গন্ধ পাই।'

আমরা সবাই মিলে সুবিমলকে 'যা যা বেশী চালাকি করিস নি।' 'চুপ কর তো, অ্যান অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট'—এই সব বলে চুপ করিয়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু বাণীদি আমাদের বাধা দিয়ে বললেন,

—'সুবিমল কিন্তু ঠিকই বলেছে। ও না থাকলে তোমাদের আজ বিপদ হতো। আমি যেখানেই যাই সেখানেই একটা কিছু বিপদ হয়। আমি অপয়া।'

আমরা বললাম, 'সে কি বাণীদি! অপয়া আবার কি! আপনার কুসংস্কার আছে জানতাম না তো।'

বাণীদি ম্লান গলায় বললেন, 'আমি এই কথাটা কত দুঃখে বলেছি তাতো জানো না। কেউ কখনো নিজের মুখে নিজেকে অপয়া বলে? জন্ম থেকেই বিপদ আমার পাশে পাশে।'

সেইদিন আমরা বাণীদির জীবনের ঘটনা শুনলাম। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে ট্রেন সেদিন ছ'ঘণ্টা বন্ধ ছিল। আমরা সেই মাঠের মধ্যেই পিকনিক করছি। শীতকাল ছিলো, তাই বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় নি। ট্রেনের কামরা ছিলো আমাদের বিশ্রামের জায়গা।

বাণীদির জীবন কাহিনী বানানো গল্পের মতন অস্বাভাবিক। অথচ বাণীদি আমাদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত বসেছিলেন, এবং ওঁর জীবনের কয়েকটা ঘটনা যে সত্যি তা আমাদের মধ্যে আরও কয়েকজন স্বীকার করলো, তারা আগেই শুনেছে।

বাণীদির শৈশব শুরু হয়েছে অদ্ভুতভাবে।

বাণীদি বললেন, 'তোমাদের মনে আছে, বিহারে একবার সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়েছিল? সেই বছরে আমার জন্ম। সেই সময় আমার বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করতেন। আমার তখন মাত্র দেড় মাস বয়েস সেই সময় এক শেষ রাত্রে শুরু হলো ভূমিকম্প। তার একটু আগেই আমি খুব কান্নাকাটি করেছিলাম বলে আমার মা জেগে উঠে আমায় কোলে নিয়ে বসেছিলেন। একটু বাদেই ঘরবাড়ি সব কেঁপে উঠলো। অনেকেই ছুটে চলে গিয়েছিল বাড়ির বাইরে। কয়েকজন আমার মাকে চেঁচিয়ে বলেছিল, শিগগির বাইরে চলে এসো। মা বলেছিলেন খুকীকে একটু শান্ত করেই আসছি। এখন বাইরে নিয়ে গেলে আরও চ্যাঁচাবে।

কিন্তু মা আর সময় পেলেন না। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বাড়িটা ভেঙে পড়লো। সেবার হাজার হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। আমাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেখা গিয়েছিল, বসে থাকা অবস্থাতেই মা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর কোলের মধ্যে আমি তখনও বেঁচে। শেষ মুহূর্তে মা মাথাটা ঝুঁকিয়ে আমার শরীরটা আড়াল করে রেখেছিলেন। আমাকে সারা জীবন কষ্ট দেবার জন্য মা আমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেলেন।'

বাণীদি কথাগুলো এমন নিরাসক্তভাবে বললেন যে চট করে কোনো মন্তব্য করা যায় না। কিন্তু এই একটা ঘটনার জন্যই অপয়া বলা যায় না কাকুকে।

বাণীদি বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝলেন তাই বললেন, 'শুধু এই একটা ঘটনাই নয়। আমি যতবার ট্রেনে চেপেছি, একটা না একটা দুর্ঘটনা হয়েছেই। এর মধ্যে বড় রকমের অ্যাকসিডেন্ট অন্তত চারবার। প্রত্যেকবারই আমার চোখের সামনে কেউ না কেউ মারা গেছে কিন্তু আমার গায়ে আঁচড়টা পর্যন্ত লাগে নি। ইডেন গার্ডেনে একবার খুব বড় একটা মেলা হয়েছিল না? আমি তখন বেশ ছোট, স্কুলে পড়ি। স্কুলের কয়েকজন বন্ধু মিলে সেই মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চেপেছিলাম। খুব জোরে যখন ঘুরছে, সেই সময় নাগরদোলায় একটা পাল্লা ভেঙে গেল। আমরা চারটি মেয়ে তখন সব চেয়ে উঁচুতে, হঠাৎ মনে হলো যেন আমরা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছি। প্রাণ-ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। সবাই, অন্যরাও গেল গেল বলেছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ধপ করে পড়লাম একটা নরম জায়গায়—পাশের একটা তাঁবুর ওপর, আমার কিছুই হল না। কিন্তু আর দুটি মেয়ের মাথায় খুব চোট লেগেছিল, আর একটি মেয়ের পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে রইল সারা জীবনের মতন। সেই থেকে আমি আর কক্ষনো নাগরদোলায় চাপি না।'

বাণীদি সেদিন এই রকম অনেকগুলো অবিশ্বাস্য অথচ সত্যি ঘটনা বলেছিলেন। তার মধ্যে আর একটির উল্লেখ করছি এখানে। সেটি সত্যই চমকপ্রদ। বাণীদি বললেন—

'তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। একদিন দুপুরবেলা আমি দোতলা বাসে চেপে যাচ্ছি কলেজ স্ট্রীটে! হাজরা মোড়ের কাছে বাসটা থেমেছে, দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমার মাসতুতো ভাই মণ্টু। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, "কি রে মণ্টু কোথায় যাবি?" মণ্টু চেঁচিয়ে বলল, "কোথাও না। এমনি আড্ডা মারছি, তুমি নাম না এখানে!" আমি বললাম, "তোরা উঠে আয় না বাসে, কলেজ স্ট্রীটের কফিহাউসে বসব!" মণ্টু আর ওর এক বন্ধু অমল, লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই চলন্ত বাসে। আমার কাছে এসে মণ্টু বলল, "তুমি কিন্তু আমাদের বাসভাড়া দেবে, আর কফি হাউসে খাওয়ার খরচও তোমার।" আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেব দেব, তোদের ডেকেই দেখছি ভুল করেছি—"

বাণীদি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'সত্যি, সেদিন কি ভুলই করেছিলাম ওদের ডেকে। আজও সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না, বিশেষ করে মণ্টুর বন্ধু অমলের কথা ভাবলে।'

আমরা বাণীদিকে বললাম, 'তারপর কি হল?'

বাণীদি বললেন, 'আমি বসেছিলাম লেডিস সীটে। পাশে একটা জায়গা খালি ছিল। সেখানে মণ্টু বসবে না অমল বসবে এ নিয়ে খুব ঝুলোঝুলি হল। অমল খুব লাজুক ধরনের ছেলে, সে কিছুতেই বসতে রাজী হল না, মণ্টু বসলো আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল অমল। বাস খানিকটা আসতেই কি রকম যেন গোলমাল টের পেলাম। বাসটা চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ধর্মতলায় ঢুকতেই দেখলাম রাস্তা একেবারে লোকে লোকারণ্য, অনেকের হাতে বড় বড় লাঠি আর ছোরা, আমরা টের পাই নি কলকাতায় কখন দাঙ্গা বেধে গেছে। কিন্তু তখন আর বাস ঘোরাবার উপায় নেই। সোজা চালিয়ে কোন থানায় আশ্রয় নিতে হবে। ওয়েলিংটনের কাছে একদল লোক বাস আটকে দিল। দুমদাম করে বোমা আর দুটো গুলির আওয়াজ শুনলাম। চোখের নিমেষে দেখলাম আমাদের পাশে দাঁড়ানো অমল গুলি বিদ্ধ হয়ে ধুপ করে পড়ে গেল। একটা আওয়াজও করতে পারল না। ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। তার পরেই বাসসুদ্ধু লোকের আর্ত চিৎকার।

এদিকে গুণ্ডারা বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সকলকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে, কাউকে নামতেও দেবে না। আমরা তাকিয়ে দেখলাম, বাসের ড্রাইভার হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত তারও গুলি লেগেছে। আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই। তখন মন্টু এক অসমসাহসিক কাণ্ড করলো। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে ছুটে গেল বাসের সামনের দিকে। ড্রাইভারের সীটের পেছনে যে তারের জাল থাকে সেটার ওপর দমাদম লাথি মেরে ছিঁড়ে ফেললো সেটাকে, তারপর লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে আহত ড্রাইভারকে সরিয়ে নিজেই চালিয়ে দিল বাসটা, মন্টু খুব ভালো গাড়ি চালায়, কিন্তু কোনদিন বাস চালায় নি। তবু ঝড়ের বেগে সেই বাস চালিয়ে গুণ্ডাদের দু'একজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে সোজা সেই বাস এনে ওঠালো মেডিকেল কলেজে। সেখানে পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে গেল মন্টু। তার কাঁধে একটা ছুরি বিঁধেছিল—

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের লোকজন এসে নামালো আহতদের, আমি ঘোর লাগা চোখে অমলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিলাম। আমার নড়াচড়া করারও ক্ষমতা ছিল না যেন, আমার দিকে তাকিয়ে কয়েকজন একটু যেন থমকে গেল। তারপর বললো, 'আপনি চুপ করে বসে থাকুন, একটুও নড়বেন না। আমরা স্ট্রেচার আনছি।'

আমি অতিকষ্টে বললাম, 'আমার, আমার কি হয়েছে?'

'আপনার বুকে বোধহয় গুলি লেগেছে। একদম নড়াচড়া করবেন না।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার বুকের কাছে শাড়িতে লেগে আছে টাটকা রক্ত। বিন্দু বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। সত্যি কথা বলতে কি সেই রক্ত দেখে আমার বেশ আনন্দই হয়েছিল। হয়তো আমার গুলি লেগেছে কখন, আমি টেরই পাই নি। কিন্তু আমি যে অন্যদের সঙ্গে দুর্ভাগ্য ভাগ করে নিতে পেরেছি এটাই আমার আনন্দ।

কিন্তু পরে দেখা গেল, আমার কিছুই হয় নি। অমলের রক্ত ছিটকে এসে লেগেছিল আমার গায়ে। অন্যান্য বারের মতন সেবারে আমার গায়ে আঁচড়ও লাগে নি। সেই দুঃখে সেবারে আমি এত কেঁদেছিলাম যে সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারি নি। আমি অন্যদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনি, তবু আমার কিছু হয় না কেন?'

বাণীদির গলা ধরে এসেছিল, বোধহয় কেঁদেই ফেলতেন। অতিকষ্টে নিজেকে

খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'সত্যিই দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে ঘোরে। টাইফয়েড মেরীর কথা শুনেছো তো। সেই যে মেরী নামে একটি মেয়ে যে বাড়িতেই যেত সেই বাড়িতেই কেউ না কেউ টাইফয়েডে মারা যেত, অথচ তার নিজের কিছুই হতো না—আমার অবস্থাও সেই রকম। আগেকার দিন হলে আমাকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হোত!'

আমরা রাণীদিকে সান্ত্বনা ঠিক দিতে পারি নি, কিন্তু এর পর অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। এর কোনো ঘটনার জন্যই তো কেউ রাণীদিকে দোষ দিতে পারবে না। আমরা আধুনিক কালের মানুষ হয়ে অলৌকিক কিছু মানতে পারি না। এই সব ঘটনাকেই কাকতালীয় বলতে হয়।

যাই হোক, সেবারের পিকনিকের পর থেকেই আমি রাণীদির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, আর যাই হোক রাণীদি মোটেই সাধারণ মেয়ে নন। প্রায়ই যেতাম ওঁদের বাড়িতে, ওঁদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল, ল্যান্স ডাউনে বিরাট বাড়ি। রাণীদি কিছুদিন একটা কলেজে পড়াচ্ছিলেন, তারপর কি কারণে যেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেই নিজের পড়াশোনাতে মেতে আছেন। ওঁর এক দাদা থাকেন আমেরিকা, আর একজন দিল্লীতে। বাড়িতে লোকজন প্রায় নেই-ই বললে হয়। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'রাণীদি, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

রাণীদি বলেছিলেন, 'কেন, পৃথিবীর সব মেয়েকেই কি বিয়ে করতে হবে নাকি? কত পুরুষ তো সারাজীবন ব্যাচিলার থাকে।'

—'তা থাকতে পারে, আপনার কখনো একলা লাগে না?'

—'না। আমি একা থাকতেই ভালবাসি।'

রাণীদির মত মেয়েকে বিয়ে করতে অনেক পুরুষই আগ্রহী হবে। তাঁর রূপ ও বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াও এক একসময় রাণীদি বেশ গান বাজনা ও গল্পে জমিয়ে রাখতে পারেন। বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে গেলে বোধহয় রাণীদির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস মুছে যেতে পারতো।

দু'তিনবার রাণীদিকে ওই বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করার পর রাণীদি হঠাৎ একবার বলে ফেলেছিলেন, 'আমি বিয়ে করতে চেয়ে দুটি ছেলেকে মেরে ফেলেছি। তারপরও আমাকে বিয়ে করতে বলো তোমরা?'

কথাটা চমকে ওঠার মত, কিন্তু রাণীদি সহজে সে ঘটনা দুটো বলতে চান নি। অনেক চেষ্টা করে জানতে হয়েছে। এক বৃষ্টি ভেজা মন খারাপ করা বিকেলে

বাণীদি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি আজ রঞ্জন আর অনুপমের কথা বলছি, তুমি আর আমাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করো না।'

একটু থেমে বাণীদি বলেছিলেন, 'রঞ্জনকে আমি চিনতাম কলেজ জীবন থেকেই। রঞ্জন আমার বাবার বন্ধুর ছেলে। আমাদের মেলামেশা অনেক সহজ ছিল। আমি রঞ্জনকে মনে মনে ভালবাসতাম, কিন্তু রঞ্জনের ছিল খুব খেলাধূলার ঝোঁক। ক্রিকেট আর ব্যাডমিন্টন খেলায় ওর খুব সুনাম ছিল। খেলার নেশাতেই ও মেতে থাকতো, হঠাৎ একদিন তার চোখ পড়লো আমার দিকে। তারপরই বিয়ের প্রস্তাব জানালো।

ওর আর আমার বিয়ে হওয়াটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারুর বাড়ি থেকেই কোনো আপত্তি হতো না, বরং সবাই খুশি হোত, আমি শুধু একটা ব্যাপারে মনে মনে একটু অস্বস্তিতে ছিলাম। রঞ্জনের নিজস্ব একটা গাড়ি ছিল। আর ও গাড়ি চালাতো দুর্দান্ত স্পীডে, সেটাতেই আমার ভয়। আমি তো নিজেকে জানি। রঞ্জনের গাড়িতে আমি থাকলে নিশ্চয়ই একদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে, অথচ একথাটা রঞ্জনকে জানানোও যায় না।

প্রায়ই ও গাড়ি নিয়ে আসতো আমাদের বাড়িতে। হর্ন বাজিয়ে ডাকতো আমাকে, আমি নিচে নেমে এলেই বলতো, "চলো আজ কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসি। ব্যারাকপুর কিংবা ব্যাণ্ডেল।"

আমি বলতাম, "কেন, অত দূরে কেন? চলো না, ময়দানে যাই।" রঞ্জন তা পছন্দ করতো না। লং ড্রাইভ ছাড়া ওর ভালো লাগে না। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম, দু'একদিন অ্যাকসিডেন্টের উপক্রমও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একদিন ওকে বলেই ফেললাম, আমার গাড়ি করে বেড়াতে ভালো লাগে না। রঞ্জন প্রথমটা তো বুঝতেই পারে না আমার কথা, কি করেই বা বুঝবে? কোনো মেয়ে কি একথা বলে? তবু আমি ওকে বললাম, আমার চেনাশুনো সব মেয়েরা পায়ে হেঁটে কি রকম বেড়ায়, কিংবা ট্রামে বাসে ঘোরে। বড় জোর কখনো ট্যাক্সিতে চাপে। কিন্তু এরকম বড়লোকের মতন সব সময় গাড়ি নিয়ে ঘুরতে আমার লজ্জা করে। রঞ্জন কয়েকবার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এরপর থেকে ও গাড়ি নিয়ে এলে আর ওর সঙ্গে বেরুতাম না। রঞ্জন খুব দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু আমার জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেললো। একদিন এক কথায় বিক্রি করে দিল গাড়িটা প্রায় জলের দামে। গাড়িটা ছিল ওর খুবই প্রিয়, গাড়ি ছাড়া ওকে

এক মিনিট দেখা যেত না পথে ঘাটে—সেই গাড়ি বিক্রি করে দিতে যে ওর মনে কতটা লেগেছিল তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। গাড়িটা বিক্রি করে সোজা রঞ্জন আমাদের বাড়িতে এসে বললো, "এবার তুমি খুশি তো?" তার দুদিন পরেই রঞ্জন মারা গেল।'

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললাম—'অ্যাঁ, কি হলো?'

বাণীদি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'রঞ্জন মারা গেল। কি করে জানো? গাড়ি চাপা পড়ে। খেলার মাঠ থেকে ফিরছিল, দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে। —রঞ্জন নিজে কখনো কাককে চাপা দেয় নি, অথচ ওকেই মরতে হলো গাড়ির তলায়। আর কেউ জানে না, কিন্তু আমি তো জানি, রঞ্জন যদি নিজের গাড়িটা বিক্রি করে না দিত তা হলে কিছুতেই এভাবে—'

আমি বাণীদিকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না বাণীদি, এটা আপনি শুধু শুধু নিজের ওপর দোষ টানছেন। অনেকেই তো গাড়ি বিক্রি করে দেয় অনেক কারণে. তা বলে তারা যদি চাপা পড়ে মরে? এটা মানে, এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার।'

বাণীদি বললেন, 'আমার সব ঘটনা সম্পর্কেই সবাই একথা বলে। কিন্তু আমার জীবনে এতগুলো আকস্মিক ঘটনা কেন ঘটে বলতে পারো?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'যাই হোক, দ্বিতীয় ঘটনাটা কি?'

বাণীদি বললেন, সেটা বলার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছো সত্যি করে বলতো?' আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম—'কি আবার ভাববো?'

—'আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছো না?'

—'ভয় পাবো কেন? আপনাকে ভালো লাগে বলেই তো আপনার কাছে যখন তখন চলে আসি। দ্বিতীয় ঘটনাটা বলুন।'

বাণীদি বললেন. 'দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় বছর পাঁচেক পরে। রঞ্জন মারা যাবার পর আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে তেমন করে মিশতুম না। আর কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় নি। আমি মন ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে প্রেম, ভালবাসা এসব আমার জন্য নয়। কিন্তু এ সব কিছু ওলটপালট করে দিল অনুপম, অনুপম অনেক দিন বিদেশে ছিল, আগে ওর সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। বিদেশ থেকে ফিরে কেন জানি না ও আমাকে খুঁজে বার করলো, নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতে লাগলো। তারপর একদিন বিয়ের প্রস্তাব

জানালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু অনুপম একেবারে নাছোড়বান্দা। আমি কেন ওকে বিয়ে করতে রাজী নই সে কথা ওকে জানাতে হবে, না হলে ও কিছুতেই ছাড়বে না। অর্থাৎ ওর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ওকে একদিন সব কথা খুলে বললাম। আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে অন্য কারুর জীবনের সঙ্গে আমি আমার জীবনটা জড়াতে চাই না। আমি অপয়া।'

অনুপম তো সেই কথা শুনে আরো ক্ষেপে উঠলো। ও বললো, "এইসব ননসেন্স তুমি বিশ্বাস করো। এ রকম কয়েন্সিডেন্স তো মানুষের জীবনে হয়ই। আমারও তো কতরকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।"

আমি বললাম "অনুপম, তোমার ব্যাপার আর আমার ব্যাপার একদম আলাদা, আমার কাছাকাছি যারাই আসে তাদেরই একটা না একটা বিপদ হয়।"

অনুপম বললো, "আমি কোনো বিপদকে গ্রাহ্য করি না। মনের জোর থাকলে মানুষ সব কিছু কাটিয়ে উঠতে পারে। আমি দেখিয়ে দিতে চাই তোমার ধারণাগুলো কত মিথ্যে।"

তারপর থেকে অনুপম আমাকে নিয়ে কতকগুলো এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলো। আমাকে নিয়ে প্রত্যেক দিনই ট্যাক্সিতে কিংবা গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে লাগলো। জোর করে দেখবার জন্য যে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয় কি না। সত্যিই কিছুই হলো না কোনোদিন। একদিন গঙ্গায় নৌকা ভাড়া করে ঘুরে এল আমাকে নিয়ে। ঝড় উঠলো না, নৌকো ডুবলো না। কলকাতায় তখন খুব কলেরা হচ্ছে। ইচ্ছে করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একগাদা আলুকাবলি আর কাটা ফল খেল একদিন। ওর কোনো অসুখ হলো না, ও আমাকে গর্ব করে বলতে লাগলো, "দেখেছো তো আমি অমর, আমার কিছু হয় না।"

সেই ক'মাস আমার সত্যি খুব আনন্দে কেটেছিল। আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম সত্যিই হয়তো দুর্ঘটনার অভিশাপ কেটে গেছে আমার ওপর থেকে। অনুপম আমার জীবনটা বদলে দিচ্ছে। তারপর অনুপম একদিন এসে বললো, "তোমার ওপর আর একটা এক্সপেরিমেন্ট বাকী আছে। তোমার তো ট্রেন সম্পর্কে ভয় আছে। তুমি আমার সঙ্গে ট্রেনে চেপে দার্জিলিং যাবে।" আমি অবাক হয়ে বললাম—"দার্জিলিং যাবো? বাঃ, তা কি করে হয়?"

অনুপম বলল, "কেন? অসুবিধে কি আছে? বাড়িতে একটা কিছু বলে ম্যানেজ করতে পারবে না?"

"এ কি তোমার বিদেশ পেয়েছ নাকি ? অসম্ভব !"

"কেন অসম্ভব কেন ? দার্জিলিংএ তোমার এক মামা থাকেন না ? তুমি তাঁর বাড়িতে থাকবে আমি হোটেলে উঠব। একসঙ্গে ট্রেন জার্নি, বেড়ানো তো হবে।"

শেষ পর্যন্ত অনুপমের প্রস্তাবে আমাকে রাজী হতে হলো। আমাদের বাড়িতে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। ট্রেনে দার্জিলিং গেলাম অস্বাভাবিক কিছু ঘটলো না। এমন কি একদিন জীপ নিয়ে ঘুরে এলাম কালিম্পং—ওদিকটার রাস্তা তখন বেশ খারাপ ছিল কিন্তু জীপের ড্রাইভার বলল এমন নিশ্চিন্তে সে বহুদিন চালায় নি। অনুপম গবের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল "দেখলে ? আমি বলেছিলাম না মনের জোরটাই আসল !"

কিন্তু বিপদটা এল অন্যদিক থেকে। আমি নিজের জন্য কখনো চিন্তা করি না। অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে কিন্তু আমার তো কখনো কিছু হয় নি, বিপদ হয়েছে অন্যদের। তাই আমি সব সময় অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করি। গাড়িতে যাবার সময় অনুপম জানালা দিয়ে সামান্য একটু ঝুঁকলেও ওর হাত চেপে ধরতাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কোনো গাড়ি এলে আমি সামনে এসে দাঁড়াতাম ওকে আড়াল করে।

একদিন ঘুম মনাস্টারির দিকে বেড়াতে গেছি বিকেলের দিকে। দুজনে পাশাপাশি আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, চমৎকার শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, এই জীবনটা কি সুন্দর। অনুপম আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সব ভয় গেছে তো ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ভাল লাগছে ?"

"খুব। এত ভাল লাগবে, কখনো ভাবি নি।"

অনুপম একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়াল। আমি একটা গান গুনগুন করতে করতে এগিয়ে গেলাম অন্যমনস্কভাবে। বেশ কুয়াশা ছিল, রাস্তাটা লক্ষ্য করি নি। একটা আলগা পাথরে পা পড়তেই আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম পাশের দিকে। পাশেই বিরাট খাদ। আমি শুধু মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলাম। তাই শুনেই অনুপম ভাবল আমার খুব বিপদ হয়েছে। লাফ দিয়ে চলে এল আমার দিকে। আমি তখন রাস্তায় পাশে পড়ে গিয়েও একটা পাথর ধরে ফেলেছি। কিন্তু অনুপম এমন হুড়মুড় করে সেখানে এসে পড়ল যে তাল সামলাতে পারল

না। ও গড়িয়ে পড়ল নিচের দিকে। আমি ভেবেছিলাম অনুপম নিশ্চয়ই কিছু একটা ধরে ফেলবে। কিন্তু তা হলো না, অনুপম চেঁচিয়ে উঠল, "বাণী, আমার হাতটা একটু ধরো। হাতটা একটু ধরো—"

আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে এসে আর সেখানে কিছুই দেখতে পেলাম না, অনুপম আর নেই।

বাণীদি গুম্ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'এখনো আমার কানে সেই ডাক ভেসে আসে, বাণী, আমার হাতটা একটু ধরো, আমার হাতটা একটু ধরো। কিন্তু আমি ধরতে পারি নি।'

বাণীদির সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল। মুখটা নিচু করা। আমি গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'বাণীদি, আমি শুধু একটা কথা বলছি আপনাকে। এসব যাই ঘটে থাক, তবু আপনাকে এখনো অনেকে ভালবাসে!'

বাণীদি আমার কথা শুনে কি বুঝলেন কে জানে। তীব্রভাবে তাকালেন আমার চোখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুনীল, তুমি আমার কাছে আর কখনো এসো না। কোনোদিন এসো না। আমি অপয়া। আমি সাংঘাতিক অপয়া। আমি তোমার ভাল চাই বলেই বলেছি। তুমি আর কোনোদিন এসো না আমার কাছে। আমি তোমার মুখও আর দেখতে চাই না কোনোদিন।'

বলতে বলতে বাণীদি ঝরঝর কেঁদে ফেললেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। এই সময় বাণীদিকে আরও বেশী সুন্দর দেখতে লাগছে।

আর কোনো সান্ত্বনার কথা আমার মনে এলো না। আমার হাতের ওপর ঝরে পড়েছে বাণীদির চোখের জলের কয়েকটি ফোঁটা। কিছু না ভেবেই আমি সেই অশ্রুবিন্দু আমার জিভে ঠেকালাম। মনে হলো, বাণীদির চোখের জল নোনতা নয়, মিষ্টি। কেন এরকম মনে হলো কে জানে।

ঘুম জাগরণ

এক সময়ে যে এখানে একটা বেশ বড় নদী ছিল, তা এখনো বোঝা যায়, যদিও নদীর চিহ্ন বিশেষ নেই। অনেকখানি ঢালু খাত, সেখানে এখন সর্ষের চাষ হচ্ছে, হাওয়ায় দুলছে অজস্র সর্ষে ফুল।

তাপস হাত বাড়িয়ে বললো, এইখান থেকে ওই পর্যন্ত নদীটা চওড়া ছিল, বুঝতে পারছিস? ওই যে ওপাশের অশ্বত্থ গাছটা, তার ধার পর্যন্ত।

ঢালু জমি দেখে অনুমান করা যায়। তবে, জল নেই কোথাও। এরকম মরা নদী আমি আগে কখনো দেখি নি। কি রকম যেন একটু দুঃখ হতে লাগলো। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীটা এরকমভাবে মরে গেল কি করে?

তাপস বললো, কত নদীই তো মরে যায়। অনেক নদী দিক পাল্টায়। এটাও সে রকমই।

—বর্ষাকালেও জল হয় না?

—হয় একটু একটু। সে তো পুকুর বা খানা ডোবাও বৃষ্টির জলে ভরে যায়। কিন্তু এটার আর স্রোত নেই। দুদিন বাদে মাটি ভরাট হয়ে গেলে আর সেটুকু জলও জমবে না।

দূরের মাঠে কয়েকজন চাষীকে দেখা যায়। এ ছাড়া আশেপাশে আর লোকালয় নেই। আছে শুধু একটা বিরাট বাড়ি। প্রাসাদই বলা যায়।

বাড়িটার বয়েসও বেশী না। সত্তর আশি হবে বড় জোর। মানুষের পক্ষে এই বয়েসটা যথেষ্ট হলেও একটা বাড়ির পক্ষে কিছু না। এখনো বেশ শক্ত সমর্থ আছে। প্রত্যেক ঘরের জানলায় নীল কাচ বসানো হয়েছিল তৈরির সময়, তার মধ্যে অনেক কাচ আজও অক্ষত।

বাড়িটা তৈরি করেছিলেন তাপসের ঠাকুর্দার বাবা। শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। তখন এখানে নদী ছিল জ্যান্ত, প্রকৃতি ছিল সুন্দর। নদীর পাড়ে বসিয়ে ছিলেন বিশ্রাম ভবন। শুধু বিশ্রামের জন্য এত বড় বাড়ি না বানালেও চলতো। কিন্তু তখনকার দিনের লোকেরা ছোট কিছু বানাতেই পারতেন না। তাছাড়া ওঁদের টাকা পয়সাও ছিল যথেষ্ট।

এই সুন্দর অট্টালিকাটিরও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। নদী শুকিয়ে গেছে। লোকালয় সবে গেছে। এখন এই মাঠের মধ্যে বাড়িটাকে বেখাপ্পা দেখায়। সেই আসল জমিদার নেই, তাপসদের অবস্থাও আগেকার মতন নয়। এতবড় বিশ্রাম ভবন ওদের কাজে লাগে না।

এত বড় একটা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করাও যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। সারা বছর ওদের পরিবারের প্রায় কেউই আসে না এখানে—শুধু শুধু বাড়িটাকে টিকিয়ে রাখার আর যুক্তি নেই।

বাড়িটাকে আর কোনো কাজেও লাগানো যাচ্ছে না। এখানে কেউ এত বড় বাড়ি ভাড়া নেবে না। রেল স্টেশন বেশ দূরে বলে মিল-ফ্যাকটারি করার পক্ষেও অনুপযোগী।

তাপসরা চেয়েছিল বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দিতে। সরকারও উৎসাহী হয় নি।

এই জনমানবহীন জায়গায় বাড়িটাকে ইস্কুল কলেজ বা হাসপাতাল করারও কোনো মানে হয় না। কাছাকাছি কোনো বড় রাস্তা বা বাসরুট পর্যন্ত নেই। বাড়িটা বিক্রির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি, তাপসরা তাই বিরক্ত হয়ে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবে ঠিক করেছে। অন্তত জানলা দরজা আর কিছু ইট বিক্রি হবে। অর্থাৎ একেবারে নষ্টই হবে সব কিছু।

আগামী মাসেই তিন তারিখে নিলাম হবে জানলা দরজা। শেষবারের মতন তাপস তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে এসেছে কয়েকদিনের জন্য। সেই টানে টানে আমিও উপস্থিত।

এত বড় একটা বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে শুনলে কার না মন খারাপ হয়। বাড়িটা যে দেখতে সুন্দর, শুধু সেই কারণেই যেন এর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এখন সব কিছুরই বিচার হয় প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। আমার বারবার মনে হতে লাগলো, আমার যদি টাকা থাকতো, আমি ঠিক কিনে নিতাম এ বাড়িটা। তারপর কি করতাম? কিছুই না। এমনিই থাকতো। তাপস আর মিলি ঘুরে ঘুরে দেখালো আমাকে সারা বাড়িটা। শুধু দোতলা আর তিনতলাতেই চোদ্দখানা ঘর। এ ছাড়া বিরাট বিরাট বারান্দা, মোটা মোটা থাম আর খিলান। একতলায় ঘরগুলি রাখা হয়েছিল শুধু চাকর-বাকরদের জন্য। এখন অবশ্য একটি মাত্র চাকর ও একজন দরওয়ান থাকে বাড়ির সব কটা ঘর খোলাই হয় নি বহুদিন।

আমরা আশ্রয় নিয়েছি দোতলার দক্ষিণ কোণের দিকে পাশাপাশি দুটি ঘরে। আরও অনেক বন্ধুবান্ধব এলে বেশ জমজমাট হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। দু'একজন আসবে বলেও আসতে পারে নি।

দিনের বেলাটা অবশ্য আমাদের ভালোই কাটে। অল্প অল্প শীত পড়েছে। দোতলার বিশাল বারান্দায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। দুপুরবেলা একটা লম্বা ঘুম দিই। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতেই সন্ধে হয়ে যায়।

সন্ধের পর আর ঠিক মতন আড্ডা জমতে চায় না। শহরের কোনো বাড়িতে তিনজন নারী পুরুষের আড্ডা দিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে এই প্রকাণ্ড নির্জনতার মধ্যে আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী, খুবই অকিঞ্চিৎকর লাগে নিজেদের। এক তলায় চাকর দারোয়ানদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কোনো কিছুর দরকার হলে চিৎকার করে ডাকতে হয়।

ইলেকট্রিক নেই, সন্ধের পরই ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুটো হ্যাজাক জ্বেলেও সেই অন্ধকারে বেশী ফাটল ধরানো যায় না। তাপস সঙ্গে ট্রানজিস্টার রেডিও আর টেপ রেকর্ডার এনেছে—তাতে গান শোনা হয় সন্ধের পর। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনতেও একঘেয়ে লাগে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাপস হুইস্কির বোতল বার করে।

তাতে আবার মিলির আপত্তি। মদ্যপান বিষয়েই যে মিলির কোনো আপত্তি আছে তা নয়। কিন্তু ও বলে, তোমরা তো বসে বসে এখন মদ খাবে। আর আমি একা একা কি করবো? দু'জন মদ্যপায়ীর সঙ্গে তৃতীয় কারুর গল্প যে বেশীক্ষণ জমে না সে কথাও ঠিক।

মিলিকেও একটু হুইস্কি খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গন্ধটা ওর কিছুতেই সহ্য হয় না। বমি আসে। একবার কোন্ পার্টিতে সে একটু শেরি খেয়েছিল, সেটা তার খুব ভালো লেগেছিল। সে শেরি খেতে চায়। কিন্তু শেরি কোথায় পাওয়া যাবে!

চার বছর আগে বিয়ে হয়েছে, মিলির এখনো ছেলেমেয়ে হয় নি। সে সব সময় সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। এখানে দেখবার কেউ নেই, তবু সে বিকালবেলা স্নান করে খুব সাজগোজ করে এসে বসে আমাদের সঙ্গে। টেপ রেকর্ডারে গান বাজায়। সেই আসরে তাপস গেলাসে হুইস্কি ঢালতেই মিলি

অমনি বলে, এই আবার শুরু হলো তো তোমাদের। তারপর রাত্তিরবেলা একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়, হাজার ডাকলেও উঠবে না।

তাপসের শরীরে এখনো জমিদারি রক্ত। সে বউকে ভয় পায় না। মিলির আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই সে হুইস্কির বোতল খোলে। আমারই বরং একটু সঙ্কোচ লাগে।

তৃতীয় রাত্রে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ বাড়িতে ভূত-টুত নেই।

তাপস হেসে উঠে বললো, ভূত? তুই আবার ভূতে বিশ্বাস করতে শুরু করলি কবে থেকে?

আমি বললাম, তা নয়। মানে, খুব পুরনো বাড়ি তো। এইসব বাড়ি সম্পর্কে সাধারণত অনেক রকম গল্প থাকে।

তাপস বললো, খুবই দুঃখের বিষয়, সে রকম কোনো গল্প তোকে শোনাতে পারছি না। এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন কিছু দেখে নি। আগে যখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল, তখন অনেক সময় তিরিশ চল্লিশজন লোক একসঙ্গে বেড়াতে এসেছে, সব কটা ঘর খোলা হতো, কেউ কিছু দেখে নি।

—চাকর-বাকরবাও কিছু দেখে নি?

—শুনি নি কখনো। কেন, তুই বুঝি গল্পের খোরাক খুঁজছিস?

মিলি চুপ করে শুনছিল। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ ভূতের কথা মনে হলো কেন আপনার?

আমি বললাম, ভূত-টুত থাকলে আমাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী বাড়তো। আমরা যে রকম সঙ্গীর অভাব বোধ করছি—

—আপনি ভূতের ভয় পান না?

রাত্তিরবেলা একটু একটু পাই, দিনেরবেলা পাই না। তবে, আজকালকার ভূতেরা তো খুব ভদ্র হয়। ভয়-টয় বিশেষ দেখায় না।

মিলি একটু চুপ করে থেকে বললো, ভূত আছে কিনা জানি না। তবে, আমার মনে হয়, এ বাড়িটাতে একটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার আছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠে বসে বললাম, তার মানে? আপনার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে।

—কি, কি শুনছি? আগে বলেন নি তো? এবারই হয়েছে না অন্যবার।

—যতবার এ বাড়িতে এসেছি ততবারই হয়েছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। আমার মনে হয়, আমায় যেন কেউ ডাকে।

তাপস বললো, ননসেন্স।

মিলি দুঃখিতভাবে বললেন, তুমি তো আমার সব ব্যাপারেই ননসেন্স বলো।

আমি তাপসকে বাধা দিয়ে বললাম, দাঁড়া না, ব্যাপারটা, শুনতে দে না!

তাপস বললো, ব্যাপারটা আর কিছুই না। মিলির একটা অসুখ আছে। সোমনামবুলিজম্ কাকে বলে জানিস তো? ঘুমের মধ্যে ঘোরের মাথায় ঘুরে বেড়ানো। সোজা বাংলায় স্লিপ ওয়াকিং যাকে বলে। মিলি এই রকম হঠাৎ হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে হেঁটে বেড়ায়।

মিলি বললো, মোটেই আমার সে রকম কোনো অসুখ নেই।

তাপস বললো, বাঃ, তোমার দাদা সেবার বলেন নি যে ছেলেবেলায় তুমি এরকম কয়েকবার বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলে পর্যন্ত।

—সে তো খুব ছেলেবেলায়।

—আবার সেটা দেখা দিয়েছে।

—কিন্তু এ বাড়িতে এলেই সে রকম হয় কেন?

—মনের জোর আনো সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি মিলিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কেউ ডাকে তার মানে কি? কারুকে চোখে দেখতে পান?

মিলিকে কোনো কথাই বলতে দিল না তাপস। বিরক্তভাবে বললো, থাক্ ও কথা থাক্, ওসব আজেবাজে কথা আমার ভালো লাগে না।

বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তাপস ঘোরতর নাস্তিক। ভগবান কিংবা ভূত কোনোটাই সে গ্রাহ্য করে না। মিলি হঠাৎ চলে গেল ঘরের মধ্যে। বুঝলাম সে রাগ করেছে।

ঘটনাটা ঘটলো সেই রাত্রেই। মিলি চলে যাবার পর তাপস আর আমি আরও অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তাপস বোতলটা পুরোই শেষ করতে চায়। চাকর এসে দু'একবার জিজ্ঞেস করেছে খাবার দেবে কিনা, তাপস তাকে ধমকে ফিরিয়ে দিল। বোতলটা শেষ হবার পর তাপস বেশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। আমি কম খেয়েছিলাম। তাপস সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোনো-ক্রমে তাকে ধরাধরি করে এনে বসালাম খাবার টেবিলে। কিন্তু খাদ্যে তার আর রুচি নেই। সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগলো।

খাবারের টেবিলে মিলি আগাগোড়া খুব গম্ভীর। আমি একটু অপরাধী বোধ করতে লাগলাম। মিলি বোধহয় ভাবলে, আমিই ওর স্বামীকে মাতাল করে দিয়েছি। সকলেই এরকম ভাবে।

খাওয়া শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসবো ?

মিলি বললো, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। আপনার যাবাব দবকার নেই।

আমি নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আমার বই পড়া অভ্যাস। কিন্তু হ্যাজাকের আলোয় বই পড়তে বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। আলো নিভিয়ে দিতেই চতুর্দিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। কেন ঘুম ভাঙলো জানি না। ঘুম ভাঙাও দু'রকম হয়। কখনো কখনো ঘুমটা একটু চিবে যায়, অস্পষ্ট জাগরণের অনুভূতি, কিন্তু চোখ মেলতে ইচ্ছে করে না। আবার কখনো হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে যায়, চোখ দুটো খুলে যায় সম্পূর্ণভাবে। আমার দ্বিতীয় রকম হলো, চোখ মেলাব পর কোনো চিন্তা না করেই আমি খাট থেকে নেমে এলাম। তারপর দেখলাম আমার ঘরের দরজা খোলা।

এজন্য কোনো খটকা লাগলো না। ঘবের দরজা আমি নিজেই বন্ধ করি নি হয়তো। কিংবা ভেজানো ছিল, হাওয়ায় খুলে গেছে। এখানে চুরি-টুরির ভয় নেই, দরজা বন্ধ করার সতর্কতারও দরকার হয় না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পাশেই তাপসদের ঘরের দরজা বন্ধ। আমার ডান পাশে বিরাট লম্বা বারান্দায় পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম বারান্দা দিয়ে। কেন এগোচ্ছি তা আমি নিজেই জানি না। এবং বেশ জোরে জোরেই হাঁটছি আমি। সারা বাড়িটা একেবারে নিঃশব্দ, সূচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। আমি শুনতে পাচ্ছি শুধু আমার পায়ের আওয়াজ।

বারান্দার একপাশে সিঁড়ি। কোনো কিছু না ভেবেই আমি তিনতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলাম। তিনতলাতেও সমান লম্বা বারান্দা। ঘরগুলিতে সব তালা বন্ধ। পুরো বারান্দাটা পার হয়ে আমি চলে এলাম আর এক কোণে। এখানে রয়েছে একটা খুল বারান্দা।

সেই খুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। আমার দিকে পেছন

ফেরা। পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে একরাশ চুল। মেয়েটি হাতে একটা মোমবাতি, হাওয়ায় তার শিখাটা অল্প অল্প কাঁপছে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

এই প্রথম আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। আমি এখানে এলাম কেন? এই মেয়েটি কে?

আমার পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় মেয়েটি ফিরে তাকালো। মিলি! আমাকে দেখে সে কিন্তু একটুও চমকে উঠলো না। একটু হেসে বললো, আসুন। এত দেরি করলেন যে।

আমার গলাটা শুকনো লাগলো। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রইলাম সেইখানে। মিলি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললো, আসুন। দেখবেন না?

এবার আমি শুকনোভাবে বললাম, কি দেখবো?

—এদিকে আসুন।

মিলি আমার হাত ধরে এনে পাঁচিলের কোণে দাঁড় করালো। তারপর বললো, সামনে তাকিয়ে দেখুন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। আমি ভাবছিলাম, আপনি আরও আগে আসবেন।

সামনের মাঠ অল্প জ্যোৎস্নার আবছাভাবে দেখা যায়। আমি সেদিকে তাকালাম।

মিলি বললো, দেখেছেন, নদীতে কত জল? নদীটা আবার বেঁচে উঠেছে। আবার এখানে মানুষজন আসবে। এ বাড়ি ভাঙা হবে না।

সামনে তাকিয়ে মনে হলো, সত্যিই নদীটা যেন জলে ভর্তি। জলের ওপর ঢেউ খেলা করছে জ্যোৎস্নায়।

আমি বললাম, বাঃ, কি সুন্দর।

আপনাকে আমি বলেছিলাম না? এখন দেখলেন তো? বিশ্বাস হলো তো?

একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, সব কিছুই চোখের ভ্রম। নদীর শুকনো গর্ভে সর্ষের খেত এই জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখাচ্ছে।

মিলি বললো, এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না?

আমি বললাম, মিলি, ঘরে চলুন।

মিলি চাপা গলায় বললো, না। আমি যাবো না। আপনি আমার সঙ্গে এখানে থাকবেন না, সুনীলদা?

—এখানে কতক্ষণ থাকবেন ?

—যতক্ষণ ইচ্ছে ?

—না ঘরে চলুন।

আমি মিলির বাহুতে হাত ছোঁয়াতেই সে আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। কি রকম যেন আনন্দ ভাব। চোখ দুটো বোজা। আমি ওর হাত ধরে টেনে আনলাম। মিলি আর কোনো আপত্তি করলো না।

দোতলায় নেমে আসতেই মিলি আমার হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো, আপনি আর আমি ছাড়া নদীটাকে কেউ দেখে নি।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মিলি দ্রুত হেঁটে চলে গেল নিজের ঘবে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাবপর ফিরে এলাম নিজেব ঘরে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হলো। চোখ মেলার পরেই ভাবলাম, গতকাল রাত্রের ব্যাপারটা কি সত্য ? নাকি আমি স্বপ্ন দেখেছি ? একবার মনে হচ্ছে স্বপ্ন, আবার মনে হচ্ছে সত্যি।

আমি উঠে চলে এলাম তিনতলায়। সেই ঝুল বারান্দায় এসে মনে হলো, হ্যাঁ, কাল রাত্রে আমি এখানে এসেছিলাম ঠিকই। একটা মোমবাতির টুকরো পড়ে আছে। মিলিও কাল রাত্রে এসেছিল এখানে।

সকালবেলা মিলির চেহারা একেবারে অন্যরকম। স্নান করে নিয়েছে। তাপসের সঙ্গে কি একটা কথায় হাসছে খুব। বুঝলাম ওদের ঝগড়া মিটে গেছে !

গত রাত্রের ব্যাপারটা মিলি একবারও উল্লেখ করলো না। আমার সঙ্গে ব্যবহারেরও কোনো আড়ষ্টতা নেই। সারাদিন ধরে আমি লক্ষ্য করলাম মিলিকে। ও কি কাল রাত্তিরের ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে ? ও কিছু বললে না বলেই আমি তাপসকে কিছু জানাতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত মনে হলো, মিলি সব ঘটনাটা ভুলেই গেছে নিশ্চয়—যদি না ও খুবই সাংঘাতিক অভিনেত্রী হয়। শুনেছি শ্লিপওয়াকাররা আগের রাত্রের কোনো ঘটনাই মনে রাখতে পারে না। এটাও হয়তো সেই ব্যাপার।

কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান হলো না কখনো। মিলি কেন আমাকে দেখে চমকে যায় নি ! কেন আমাকে দেখে বলেছিল, আপনি এত দেরি করলেন কেন ? আমার তো কোনো কথা ছিল না মিলির সঙ্গে মধ্য রাত্রে নিরালায় দেখা করার ? এমনকি চোখের কোণে ইশারাও হয় নি !

আমি মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে সোজা তিনতলায় গেলাম কেন? মিলি যে ওখানে থাকবে আমি তো তার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না।

তাহলে আমিও কি ঘুমের মধ্যে হেঁটে গেছি? কিন্তু আমার যে সব মনে আছে।

কোনোদিন এই ঘটনাটা মিলির কাছে আর উল্লেখ করতে পারি নি। কি জানি, যদি মিলিও আমাকে অবিশ্বাস করে!

ভয়

'তোমাকে তো আমি বললাম, আমার খুব দরকারি একটা কাজ ছিল। আর থাকতে পারব না। সেইজন্যই হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম। আসলে কিন্তু আমার কোনো কাজই ছিল না। দেখ না, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে এখন তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি।'

'কেন যে চলে এলাম! আসল কারণটা বলব? রাগ করবে না? আসলে আমার ভয় করছিল।'

এই পর্যন্ত পড়েই শান্তনু এমন রেগে গেল যে চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

সব সময় খালি ভয় আর ভয়! এই ভয়ের জ্বালায় আর পারা যাবে না। ওরা কি চুরি ডাকাতি কিংবা মানুষ খুন করেছে যে সব সময় ভয় পেতে হবে?

যেদিনকার কথা লিখেছে স্নিগ্ধা, সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। সকাল এগারোটার সময়। সেই সময় চেনাশুনো অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। অফিস পালিয়ে আসতে হয়েছিল শান্তনুকে। অফিসেরই কাজ নিয়ে ডালহৌসিতে যাবার বদলে চলে এসেছিল আলিপুরে।

কলকাতা শহরের যে-কোনো জায়গায় দেখা করতেই ভয় পায় স্নিগ্ধা। সারা কলকাতাতেই নাকি ওর আত্মীয়-স্বজন ছড়ানো। সেই সব আত্মীয়রা ধারালো চোখ নিয়ে সব সময় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্নিগ্ধাকে দেখে ফেলার জন্য।

স্নিগ্ধার বাড়িতে ফোন করার উপায় নেই, চিঠি লেখার উপায় নেই। বাইরে দেখা করতে গেলে তো প্রায় একটা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা করতে হয়!

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে। প্রত্যেক চিঠিতেই সে আকুতি জানায়, কখন শান্তনুকে দেখবে। শান্তনুকে সে প্রত্যেকদিন দেখতে চায়, অথচ দেখা করতেও ভয়। এতো মহা মুশকিল!

একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার উপায় নেই। কোনো প্রকাশ্য জায়গায় পাশাপাশি বেড়াবার তো প্রশ্নই ওঠে না। একটা মাত্র জায়গা আছে, মিউজিয়াম, যেখানে

কলকাতার বাঙালীরা সাধারণত যায় না। কিন্তু সেখানেও যাওয়া চলে না বারবার, স্নিগ্ধার ধারণা, দারোয়ান, চাপরাশিরা তাকে চিনে ফেলছে। চিনে ফেললেই বা যে কি বিপদ, তা বোঝে না শান্তনু। চিনুক না! তারা তো মিউজিয়ামে কিছু চুরি করতে যাচ্ছে না!

আর একটা জায়গা হচ্ছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এখানে স্নিগ্ধাকে মাঝে মাঝে বই নিতে আসতে হয়। বাড়ির অনুমতি আছে। তাও স্নিগ্ধা আসবে সকালের দিকে। বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলা এখানে অনেক ভিড় হয়ে যায়, তাদের মধ্যে চেনাশুনো কেউ কেউ তো থাকতেই পারে। অফিসের দিনে সকাল সকাল আসতে গেলে শান্তনুকে যে কী অসুবিধেয় পড়তে হয়, তা সে শুধু নিজেই জানে, স্নিগ্ধাকে বলে নি কখনো।

শান্তনু এটাই শুধু বুঝতে পারে না, কেউ দেখে ফেললেই বা ভয়ের কী আছে? সে স্নিগ্ধাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করার জন্য বদ্ধপরিকর। স্নিগ্ধাও অন্য কারুকে বিয়ে করবে না. বাড়ির যদি খুব অমত থাকে, স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে চলে আসতেও রাজি।

অবশ্য স্নিগ্ধার বাড়ি থেকে আপত্তি করাব বিশেষ কোনো কারণও নেই। শান্তনু পড়াশুনোয় ভালো ছিল, এখন মোটামুটি ভালোই চাকরি করে। পরিচ্ছন্ন সচ্ছল পরিবারের ছেলে। স্নিগ্ধাদের বাড়িতে জাত-বিচারের বাড়াবাড়ি নেই, স্নিগ্ধার জ্যাঠতুতো দাদা অসবর্ণ বিয়ে করলেও বাড়ির লোক তাদের ভালোভাবেই মেনে নিয়েছে।

মুশকিল বাধিয়েছেন স্নিগ্ধার বাবা। ভদ্রলোক বেশ ভালোমানুষ, অর্থনীতির অধ্যাপক, বেশ সুরসিক। কিন্তু তিনি হঠাৎ ইরানে ভিজিটিং প্রফেসারের চাকরি নিয়ে চলে গেছেন এক বছরের জন্য। ওঃ, সেই এক বছরটা কি অসম্ভব লম্বা! স্নিগ্ধার বাবাকে এখনো কথাটা জানানোই হয় নি।

স্নিগ্ধা চিঠি লিখে বাবাকে জানাতে চায় না। বাবা ভাববেন, তিনি নেই বলে মেয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। শান্তনুকে চোখে না দেখে বাবা বুঝবেন কি করে যে কোন্ রকম ছেলে সে। বাবা ফিরে এলে সে বাবাকে নিজের মুখে বলবে। এই জন্য মাকেও কিছু জানতে দিচ্ছে না। কারণ মা তাহলেই বাবাকে চিঠি লিখবেন। অতদূর ইরান থেকে তো শুধু শুধু হঠাৎ চলে আসা যায় না। বাবা যদি চিঠি পেয়ে চলে আসেন, সেটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।

শান্তনু অবশ্য এক বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছে। কি আসে যায়

এক বছরে। কিন্তু তা বলে কি এই এক বছর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ থাকবে? স্নিগ্ধার যুক্তি হচ্ছে, যদি কোনো রকমে কোনো আত্মীয়-স্বজন একবারও স্নিগ্ধাকে শান্তনুর সঙ্গে ঘুরতে দেখে, তাহলেই তারা কথাটা মায়ের কানে তুলবে। মা অমনি বাবাকে চিঠি লিখবেন। বাবা অতদূরে বসে দুঃখ পাবেন। বাবাকে যে দারুণ ভালবাসে স্নিগ্ধা।

শান্তনু ঠাট্টা করে, তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে তোমার পাশে কোনো ছেলেকে হাঁটতে দেখলেই অমনি তোমার মায়ের কাছে নালিশ করতে যাবেন?

স্নিগ্ধা বলে, নালিশ নয়, এমনি যদি কথায় কথায় বলে দেয় কেউ—

—বলুক না। তোমার মাকে তুমি বুঝিয়ে বলবে।

—আমার লজ্জা করে।

লজ্জা আর ভয়। এই দুটো জিনিসই যেন ভালবাসার প্রধান শত্রু। সব সময় দুজনে তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে একটু দেখা করার জন্য, কাছাকাছি বসে একটু কথা বলার জন্য—আর কেউ এতে বাধা দিচ্ছেও না। যত বাধা এই লজ্জা আর ভয়।

সেদিন অত কষ্ট করে শান্তনু গেল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। ভেতরে কথা বলার সুযোগ নেই, তাই ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে একটা গাছের নিচে। পাতলা রোদ সবুজ ঘাসে মোলায়েম হয়ে ছড়িয়ে আছে।

স্নিগ্ধার হাতে দুটি বই। একটা শান্তনুকে দিয়ে বলল, এটা তোমার হাতে রাখো।

—কেন?

—তাহলে সবাই ভাববে, তুমিও বই নিতে এসেছ লাইব্রেরীতে।

শান্তনু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, এখানে সবাইটা কোথায়? কেউ তো নেই! আমাদের শুধু দেখছে ওই বড় বড় গাছগুলো!

স্নিগ্ধা বলল, আস্তে আস্তে তো লোকজন আসবে।

শান্তনু বলল, চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।

স্নিগ্ধা একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, না।

—কেন, এতে আবার কি অসুবিধে?

—এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই তো ভাল লাগছে।

স্নিগ্ধা কারণটা না বললেও শান্তনু বুঝল। ঘাসের ওপর বসলে দৃশ্যটা অনেক

ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বললে, কেউ দেখে ফেললেও মনে করবে, দুজন ছাত্রছাত্রী বুঝি পড়াশুনোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

একটা উজ্জ্বল লাল রঙের সোয়েটার পরে ছিল স্নিগ্ধা। মাথার চুল এক বেণী করে বাঁধা। নামের সঙ্গে তার মুখটার খুব মিল আছে। চোখ দুটোর দিকে তাকালেই কি রকম যেন ঠাণ্ডা লাগে। মুখে সব সময় একটা লজ্জা ভাব।

একটুবাদেই স্নিগ্ধা বলল, তুমি এবার যাবে না?

শান্তনু অবাক হয়ে বলল, চলে যাব? এক্ষুণি? কেন?

—বাঃ, তোমার অফিস নেই?

—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করব!

—না, না, অফিসে যদি তোমার নামে কেউ কিছু বলে, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

—কে কি বলবে? আমি তো একটা কাজেই বেরিয়েছি, কাজটা ঠিকই সেরে ফিরব। কাজটার জন্য এক ঘণ্টার বেশী দেরিও তো হতে পারে।

স্নিগ্ধা ঠিক যেন মানলো না। তার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে রইল। ঘাসে বসা হল না বলে শান্তনু প্রস্তাব করল একটু হেঁটে বেড়াতে। স্নিগ্ধা তাতেও রাজি হতে চায় না। অনেক পেড়াপীড়িতে সে এক পাক মাত্র ঘুরতে রাজি হল।

একবার স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখার জন্য শান্তনুর বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু তার উপায় নেই। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে স্নিগ্ধার শরীরের সুন্দর গন্ধটা উপভোগ করে শান্তনু। সবচেয়ে কি স্বাভাবিক ছিল না, স্নিগ্ধাকে এখন একবার জড়িয়ে ধরা। এখানে, প্রকাশ্যে, আকাশের নিচে তাকে একবার চুমু খাওয়া? কিন্তু সে তো কল্পনাই করা যায় না।

শান্তনু খপ করে স্নিগ্ধার একটা হাত চেপে ধরল।

স্নিগ্ধা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিল হাতটা। চোরা চোখে তাকে একবার বকুনি দিল।

তারপর যেখান থেকে হাঁটতে শুরু করে ছিল, সেইখানে এসেই স্নিগ্ধা বলল, এবার তুমি যাও!

—এ কি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো?

—বাঃ, তোমার অফিসের কত দেরি হচ্ছে।

—হোক!

—না। না, আমার ভয় করে

—আবার ভয়! স্নিগ্ধাও হেসে ফেলল এবার। তারপর বলল, আমার মতন একটা বাজে বিচ্ছিরি মেয়েকে নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছো, তাই না?

শান্তনু বলল, খুব! দারুণ বিপদ! ওই ছাখো। ওই একজন আত্মীয় আসছে তোমার।

কোথাও একজনও মানুষ দেখা যায় না। শুধু বড় বড় গাছপালা ওদের দর্শক।

শান্তনু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা. শোনো, আমরা যদি ওইখানে সরে গিয়ে ওই রাধাচূড়া গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

—কেন, ওখানে কি আছে?

—কিছুই না। ওখানে দাঁড়ালে আমাদের সহজে দেখা যাবে না।

—ওখান দিয়ে লোকজন হাটে না বুঝি?

—ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি, যদি একটি লোককেও ওখানে আসতে দেখি, এক্ষুনি আমরা চলে আসবো। লোক না-আসা পর্যন্ত আমরা ওখানে দাঁড়াবো। রাজি?

স্নিগ্ধাকে রাজি হতেই হল। জায়গাটা সত্যি নির্জন। তবু, এই নির্জনতার মধ্যেও শান্তনু স্নিগ্ধার কাঁধে হাত রাখলো না। চুমু খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একটু বেশি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য. এক একবার কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যায়, শান্তনু সিগারেট মুখে দিলে স্নিগ্ধা দেশলাই জেলে দেয়। এইটুকুতেই অনেকখানি পাওয়া।

স্নিগ্ধা এক সময় বলল, বাঃ, লোক না এলেও বুঝি আমরা এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবো?

—আমি এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তুমি পারো না?

—শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

—আমার তো শুধু তোমাকে দেখতেই ভাল লাগে

—আমার ভয় করে

—আবার ভয়? এখানেও ভয়?

স্নিগ্ধার চোখ দুটি আরও বেশি চঞ্চল। সে সুস্থির হতে পারলে না কিছুতেই। এবার অনুনয় করে বলল। শোনো লক্ষ্মীটি, আমার একটা দারুণ কাজ আছে, আমাকে বারোটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

—বারোটার মধ্যে? তাহলে তো এক্ষুণি যেতে হয়।

—হ্যাঁ, বই দুটো বদলেই

—মোটে এইটুকু সময়ের জন্য আমি এলাম?

—লক্ষ্মীটি রাগ করো না, আর একদিন।···

—কি কাজ তোমার?

—বিশ্বাস করছো না? মাকে বলে এসেছি, মাকে এক জায়গায় যেতে হবে···

স্নিগ্ধাকে আর আটকানো যায় নি কিছুতেই। শান্তনু খানিকটা ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এসেছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো সন্দেহ করত, স্নিগ্ধা বুঝি শান্তনুকে তেমন ভালবাসে না। সে বুঝি শান্তনুর কাছে মিথ্যে কথা বলে অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিন্তু স্নিগ্ধা সম্পর্কে সেরকম সন্দেহ কিছুতেই করা যায় না। কারুকে ঠকাবার কোনো ক্ষমতাই নেই স্নিগ্ধার।

মেঝে থেকে শান্তনু স্নিগ্ধার দলা পাকানো চিঠিটা আবার তুলে নিল। পড়তে লাগল পরের অংশটুকু।

···রাগ করবে না? আসলে আমার ভয় করছিল। কিসের ভয় জানো? কারুর দেখে ফেলার ভয় নয়। ভয় করছিল নিজেকেই। আমার মনে হচ্ছিল, বেশিক্ষণ থাকলে, আমাকে যদি তোমার আর দেখতে ভাল না লাগে? আমি তো সুন্দরী নই। তুমি কত সুন্দর। তোমার সামনে আমাকে কেমন যেন··· আমি বেশি সাজতেও পারি না, আমার ভয় হয়, যদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুমি হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নাও। আমার চিবুকটা বিচ্ছিরি, তাই না?

শান্তনু আবার অবাক হল। এ আবার কী রকম ভয়? স্নিগ্ধাকে তার দেখতে খারাপ লাগবে? যাকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করে, হঠাৎ কোথাও আচমকা দেখা হয়ে গেলে সে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যায়, সেই স্নিগ্ধাকে দেখতে তার খারাপ লাগবে? স্নিগ্ধার মতন সুন্দরী আর কে আছে? ওর চিবুকে একটা ছোট্ট কাটা দাগ, সেই জন্যই মুখটা আরও মিষ্টি দেখায়, ইচ্ছে করে ওই কাটা জায়গাটায় চুপুস করে একটা চুমু খেতে। এই জন্য স্নিগ্ধা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। কোনো মানে হয়!

পরে কোথায় আবার দেখা হবে, সে সম্পর্কে স্নিগ্ধা কিছু লেখে নি। তার মানে এখন দু'তিন দিন আর স্নিগ্ধা বাড়ি থেকে বেরুবে না। স্নিগ্ধার অন্য ভাই-বোনরা ছোট ছোট। বাবা এখানে নেই বলে স্নিগ্ধাই যেন এখন বাড়ির

অভিভাবক। ওর মতন নরম মেয়েকে কি ভাইবোনরা মানে একটুও? বাবা এখন এখানে নেই বলেই, সেই সুযোগে স্নিগ্ধা এখন প্রেম করে বেড়াচ্ছে—এই অপবাদটাকেই স্নিগ্ধার বেশি ভয়!

এদিকে অফিসের কাজে তিন দিন পর আবার শান্তনুকে পাটনা যেতে হবে। তার মানে এর মধ্যে আর স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হবে না? পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতেও তো তিন চারদিন লাগবে। পাটনা যাওয়ার কথাটা স্নিগ্ধাকে জানাবেই বা কি করে?

স্নিগ্ধা চিঠি লেখে কিন্তু শান্তনুর চিঠি লেখার উপায় নেই। টেলিফোন করাও চলবে না। স্নিগ্ধাই কখনো সখনো, বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকলে শান্তনুকে টেলিফোন করে, বাড়িতে কিংবা অফিসে। যদি স্নিগ্ধা সেরকম ফোন করে।...

পাটনা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনুর পাঁচ দিন লেগে গেল। ফেরার পথে আর এক ঝামেলা। ট্রেন কলকাতায় এসে পৌছোবার কথা ভোরে, কিন্তু এঞ্জিনে গণ্ডগোল হওয়ায় গাড়ি মাঝ রাস্তায় থেমে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আগের জংশনে খবর দিয়ে নতুন এঞ্জিন আনতে আনতে পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। অতক্ষণ থেমে থাকা ট্রেনে অপেক্ষা করা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তাও মাঠের মধ্যে। কিছুই করার নেই। নেমে পায়চারি করতে গেলেও চড়া রোদ গায়ে বেঁধে। হঠাৎ শীত চলে গিয়ে গরম পড়ে গেছে। প্রথম গ্রীষ্ম দারুণ চিটচিটে হয়। ট্রেনের মধ্যে বসে থাকলেও গরম, বাইরে রোদ্দুরে ঘোরাও অসম্ভব। ঘামে জামা-টামা চিটচিটে হয়ে গেল। মুখে বিরক্তির ভাঁজ।

হাওড়া স্টেশনে পৌছেও আর এক ঝামেলা। ট্যাক্সি নেই। অনেক দৌড়োদৌড়ি করেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত, এক ভদ্রলোকের প্রাইভেট গাড়ি ওকে হাজরা মোড় পর্যন্ত নামিয়ে দিতে রাজি হল।

হাজরায় পৌছে, হাতের ছোট ব্যাগটা নিয়ে শান্তনু গাড়ির ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে যেই মুখ তুলল, অমনি দেখল এক অপরূপ দৃশ্য।

রাস্তার ওপারে, বাস গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধা। সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সেই মেয়েটিও বোধহয় এক্ষুণি চলে যাবে, কেননা, একবার একটুখানি চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে কি যেন বলল। স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করার এমন আকস্মিক সুযোগ পাওয়া যায় না। বুকের মধ্যে থেকে একটা খুশি লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু শান্তনু তার চিবুকে হাত বুলোল। দাড়ি কামানো হয় নি, বেশ খোঁচাখোঁচা দাড়ি টের পাওয়া যাচ্ছে। মুখে চটচটে ঘাম। জামাটাও ঘামে জবজবে। সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনে পা-জামা পরে ছিল, তার ওপরেই শার্ট পরে নিয়েছে। এই চেহারায় সে স্নিগ্ধার সামনে দাঁড়াবে?

শান্তনু আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে সামনের চলন্ত মিনিবাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাড়িতে এসেই কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল আবার। এরকম দুর্লভ সুযোগ পেয়েও সে স্নিগ্ধার কাছে যেতে পারল না? আজ যা দেরি হয়ে গেছে, অফিসে যাবার কোনো প্রশ্ন নেই--স্নিগ্ধার সঙ্গে দুটো চারটে কথাও তো বলতে পারত অন্তত, তবু কেন গেল না? তার লজ্জা করছিল? কিংবা ভয়?

পরদিনই স্নিগ্ধার চিঠি এল।

'জানো, কাল তোমাকে দেখলাম? নিজের চোখকে আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি। হঠাৎ মনে হল যেন স্বর্গ থেকে দেবতারা আমার জন্য একটা পুরস্কার পাঠালেন। তুমি একটা কালো রঙের গাড়ি থেকে হাজরা মোড়ে নামলে। আমি হাত তুলে তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার বোধহয় খুব তাড়া ছিল, তুমি একটা মিনিবাসে উঠে পড়লে। তুমি আমায় দেখতে পাও নি, আমি কিন্তু তোমায় দেখে নিয়েছি। আমার ভাগ্যটা কত ভাল বল তো!

দাড়ি কামাও নি, মুখে নীল নীল দাড়ি, পাজামার ওপরে একটা লাল চেক চেক শার্ট পরেছিলে। তোমাকে কি ইয়াং আর কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল।'

একজন মানুষ

দরজার কাছে আর্দালিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তপন বেশ শব্দ করে ভেতরে ঢুকে গেল।

বিরাট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বড় সাহেব। তাঁর চেহারাটি এত বিরাট যে এতবড় টেবিল না হলে একটুও মানাতো না। টেবিলের ওপর প্রচুর কাগজপত্র ও ফাইল। ঘরে আর কেউ নেই।

বড় সাহেব মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে বললেন, কি ব্যাপার?

তপনের হাতে একটা চিঠি, সেটা সে বড় সাহেবের নাকের কাছে ঠেলে দিয়ে বললো, এটা কে লিখেছে?

—তার মানে? চিঠির নিচেই তো সই আছে।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি? কিন্তু এরকম চিঠি লেখার মানে?

—আপনাকে কেন ছাঁটাই করা হবে না। তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। আপনি কাজকর্মে ফাঁকি দেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছুটি—

আর আপনিই বা কি কাজ করেন? সারাদিনে শুধু কয়েকটা সই মারা।

—তপনবাবু!

—চোখ রাঙাচ্ছেন কি?

—এটা বেয়াদপি করার জায়গা নয়!

—চোপ শালা!

তপন তার হাতের চিঠিটা গোল্লা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল বড় সাহেবের দিকে।

বড় সাহেব কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, আপনার চাকরি করার ইচ্ছে নেই দেখছি।

—তোমার এই চাকরিতে আমি ইয়ে করি

—ভদ্রভাবে কথা বলুন।

—তুমি কি ভদ্দরলোক যে তোমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবো? একটা চোর। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার

—ইনসেন। কমপ্লিটলি ইনসেন

—মোটেই না। আমাকে পাগল সাজালে তোমার সুবিধে হয়, তাই না?

বড় সাহেব তার টেবিলের নিচের কলিং বেল বাজালেন। শব্দ হলো, চ্যাঁ, চ্যাঁ—

তপন টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা তুলে মারমূর্তিতে বললো, খুন করে ফেলবো! একেবারে খুন করে ফেলবো.

না, দৃশ্যটা এ রকম নয়। তপন এরকম পারবে না।

দরজার বাইরে টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল রামখিলাওন। তপন ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে সে বাধা দিয়ে বললো, এখন যাবেন না। সাহেব ব্যস্ত আছেন।

তপন গম্ভীরভাবে বললো, আমিও খুব ব্যস্ত। আমাকে এক্ষুণি দেখা করতে হবে।

—সাহেব খুব রাগ করবেন!

—কেন বাজে বকবক করছো! আমার সঙ্গে সাহেবের দেখা করার কথা আছে এই সময়।

রামখিলাওনের বাধা উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে পড়লো তপন।

বড় সাহেব তখন একটা গল্পের বই পড়ছিলেন। সাধারণত তাঁর কাজকর্ম শুরু হয় সন্ধের পর।

তপনকে দেখে তিনি বিরক্তি গোপন করে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?

তপন গম্ভীরভাবে বললো, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি।

—এখন। আমার সঙ্গে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঠিক আড়াইটার সময়। এক্ষুণি এসে পড়বেন।

তপন তবু শান্তভাবে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো। নির্বিকারভাবে বললো, তিনি আসুন আগে, তারপর আমি উঠে যাবো।

তপন পকেট থেকে টাইপ করা কাগজটা বার করতেই বড় সাহেব বললেন, ওসব আমার কাছে কেন? পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে এর উত্তর দিয়ে দিলেই হবে।

আমি উত্তর দিতে আসি নি।

—তবে?

—আমি আপনাকে রেজিগনেশনের চিঠি দিতে এসেছি।

বড় সাহেব কয়েক মুহূর্ত থমকে গেলেন। তারপর বললেন, কি? চাকরি ছেড়ে দেবেন?

—হ্যাঁ। আপনারা তো তাই চান!

—আপনি কাজকর্ম করেন না মন দিয়ে, জরুরী ফাইল হারিয়ে ফেলেন, আপনাকে রাখি কি করে?

—আমি আর কাজ করতেই চাই না।

—অন্য কোথাও কিছু পেয়েছেন?

—না।

—তা হলে! এই বাজারে

—তা হোক। আমি যদি খেতে নাও পাই। আমার বিবেকটা অন্তত পরিষ্কার থাকবে। একটা চোর কোম্পানি, যারা দু'নম্বর খাতা করে লক্ষ লক্ষ টাকা গাপ করছে, ব্ল্যাক মার্কেট হচ্ছে যাদের প্ররোচনায়

—তপনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়ে গেছে। আপনি মিঃ খেমকাকে আপনার ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। আর অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টকে আমি বলে দিচ্ছি। আপনার যা পাওনা আছে নিয়ে যাবেন

বড় সাহেব চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে বেল টিপলেন।

তপন হাসিমুখে বললো, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার যা যা বলার আছে, আমি আজ সব বলে যাবো। আমি দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি, মালিকপক্ষ কি করে গোপনে টাকা সরায়। আপনিও তো মালিক নন, আপনিও তো কোম্পানির চাকর। একটু বড় চাকর এই যা। আপনার বিবেক নেই, আমার এখনো আছে। দিনের পর দিন আমি বিবেকের যন্ত্রণায় ভুগেছি। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এসব কি করছি আমি? মালিকের স্বার্থে আমি দেশে ব্ল্যাক মার্কেটের প্রশ্রয় দিচ্ছি। একটা বিরাট দুর্নীতির চক্রে আমিও জড়িয়ে পড়ছি। এইসব ভেবেই আমার কাজ করতে ইচ্ছে করতো না। অফিসে আসতে ইচ্ছে করতো না

—তপনবাবু, আমি আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই না

—সত্যি কথা শুনলে বুঝি গায়ে জ্বালা ধরে?

—আপনি এখন যাবেন কিনা! চ্যাঁ চ্যাঁ

—আমার সব কথা এখনো শেষ হয় নি! চাকরি যখন ছেড়েই দিচ্ছি—

না। দৃশ্যটা এরকমও নয়। আসল দৃশ্যটা এই। তপন অনেকক্ষণ থেকেই

ঘোরাঘুরি করছিল বড় সাহেবের ঘরের কাছে। এক একবার দরজার কাছে গিয়েও ফিরে আসছে আবার।

একবার রামখিলাওনের চোখে চোখ পড়তেই সে কুণ্ঠিতভাবে বললো, কি দারোয়ানজি, সাহেব খুব ব্যস্ত ?

—হ্যাঁ, বাবু!

—ইয়ে, দারোয়ানজি, আপনাদের তো জামা কাপড়ের জন্য অ্যালাউয়েন্স দিচ্ছে

রামখিলাওন উৎসাহিত হয়ে বললো, তাই নাকি ? অর্ডার পাস হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি। বছরে তিনবার জামা কাপড়

তারপর বিনীতভাবে আবার বললো, দারোয়ানজি, বড় সাহেবের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার মাত্র পাঁচ মিনিট

—যদি রাগ করেন

—আমি বেশী সময় নেবো না। ঠিক পাঁচ মিনিট

—ঠিক আছে যান্।

বড় সাহেব খুব তন্ময় হয়ে একটা ফাইল দেখছিলেন। ঘরে কোনো মানুষ ঢুকেছে, তা লক্ষ্যই করলেন না।

তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে। কিছু বলার সাহস নেই। এদিকে ঘরে যদি আবার কেউ এসে পড়ে!

একটু বাদে সে গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, স্যার—

বড় সাহেব মুখ তুলে বললেন, কি ?

—স্যার

—কি ব্যাপার বলুন ?

—স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু শুধু স্যার স্যার করছেন কেন ? কি বলবেন বলুন!

তপনের মনে পড়লো জয়ার মুখ। মাত্র এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে। শিগগিরই ছেলেমেয়ে হবে। জয়া বার বার বলে দিয়েছে, একদম মাথা গরম করবে না। কি ঢলঢল নরম মুখ, জয়ার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে টনটন করে

—কি তপনবাবু, আমার জরুরী কাজ আছে

—স্যার, এই চিঠিটা

—ওই চিঠির উত্তর তো আপনাকে লিখে জানাতে হবে। মুখে বলে তো লাভ নেই।

তপন একেবারে টেবিলের সামনে এসে একটা চেয়ার ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ গলায় বললো, স্যার, আমার চাকরি গেলে আমি একদম মরে যাবো। আমি নয়, আমার ফ্যামিলি

—এখন এসব কথা বললে কি হবে? আপনাকে আগেও দু'তিনবার ার্নিং দেওয়া হয়েছে

—স্যার, আর কোনোদিন আমাব কাজে কোনো ভুল পাবেন না। আপনি টু দয়া করুন।

—শুনুন তপনবাবু, এটা একটা অফিস। কোম্পানি আমাকে তো দয়া ক্ষিণ্য দেখাবার জন্য রাখে নি! কাজের বদলে মাইনে দেবে। শুধু শুধু মুখ খে তো আর

—স্যার, আপনাব কাছে প্রমিস করছি, আর কোনোদিন কাজে যদি ভুল ন—

—আপনার কথা বিশ্বাস করা যায় না। আপনি জরুরী কাজ ফেলে রেখে াৎ হঠাৎ ডুব মারেন। গত চারদিনও তো আসেন নি।

—স্যার, আমার স্ত্রীর অসুখ

—তপনবাবু, ইউ আর অ্যান হোপলেস লায়ার! গতকাল সন্ধেবেলা পনাকে আর আপনার স্ত্রীকে আমি একটা সিনেমা হলে দেখেছি। আমিও মার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা আমাদের দেখতে পান নি। কিন্তু মি দেখেছি। গড ফরবিড, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য বেশ ভালোই হয়েছে তো!

—স্যার, সী ইজ প্রেগনেন্ট। এই সময় যদি আমার চাকরি যায়, কি অবস্থা হবে ভেবে দেখুন। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে

—তা বলে কি এক বছর ধরেই হনিমুন করবেন! অফিসের কাজ করতে া! কোম্পানি কি এসব কথা শুনবে

—কোম্পানি না বুঝলেও আপনি বুঝবেন। আপনি একটু চেষ্টা করলেই……। অফিসের সবাই বলে, আপনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেন। আপনি কলে আমরা

—দিন। চিঠিটা দিন।

হাতে নিয়ে বড় সাহেব একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর